ভগবদ্গীতায় বিজ্ঞান অন্বেষণ এবং অন্যান্য

অনন্ত বিজয় দাশ

দিনকয়েক আগে হঠাৎ করেই একটি পত্রিকা হাতে আসে; পত্রিকাটি দেখে প্রথমে এড়িয়ে যেতে চাইলেও প্রথম পাতার মধ্যখানে ঢাউস আকারে ছাপানো একটি খবরে অজানা কারণে চোখ আটকে যায়। তাই এবার আর এড়িয়ে না গিয়ে পড়তে বসলাম। খবরটি পড়ার পর আমার কী অনুভূতি হয়েছিল তা এখন আর উল্লেখ করলাম না, পাঠকদের অবগতির জন্য শুধু ঐ খবরটি হুবহু তুলে দিলাম :—

জটিল সমস্যা নিরসন করে শ্রীমদ্ভগবদগীতা—আলবার্ট আইনস্টাইন

আলবার্ট আইনস্টাইন কালজয়ী এক নাম। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইন। বিজ্ঞান জগতে অনেক বিজ্ঞানীর অবদান সময়ের আবর্তে নূতন নূতন আবিষ্কারের ফলে হয়তো ধরে রাখতে পারে না তার বিস্ময়। হয়ে পড়ে কিছুটা ম্লান। কিন্তু বিজ্ঞান জগতে আইনস্টাইন এর অবদান স্বর্গেও পারিজাত সদৃশ। আইনস্টাইনের ভরশক্তি সমীকরণ $E = mc^2$ এবং আপেক্ষিকতা তত্ত্ব আবিষ্কার এই পৃথিবী গ্রহে নয়; এমনকি ভিন্ন গ্রহে যদি কোন মানুষ বাস করে সেখানেও সৃষ্টি করবে একই বিস্ময়, একই কৌতূহল।

এখানে বিস্ময়ের ব্যাপার হল আইনস্টাইন ইহুদি বংশোদ্ভুত হয়েও নিয়মিত শ্রী শ্রী গীতা চর্চা করতেন। আরও বিস্ময় এবং মজার ব্যাপার হল যে নিয়মিত গীতা পাঠ এবং গীতা ধ্যানের ফসলই হল আইনস্টাইনের উক্ত দুটি যুগান্তরকারী আবিষ্কার।

ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাজত্বের শেষ প্রহর। ব্রিটিশরা বুঝতে পেরেছিল ভারতবর্ষে তাদের রাজত্বের মেয়াদ শেষ। তাদেরকে সবকিছু গুটিয়ে অচিরেই ভারত ছেড়ে যেতে হবে। তারা চিন্তা করল যদি ভারত ছাড়তে হয়, তবে ভারত থেকে এমন এক অমূল্য সম্পদ তারা নিয়ে যাবে, যার আবেদন বিশ্বজনীন এবং কালজয়ী। বলা বাহুল্য এই কালজয়ী অমূল্য সম্পদ আর কিছুই নয়, তা হল ইংরেজিতে অনুবাদ করা শ্রী শ্রী গীতা। শ্রীমদ্ভগবদগীতার অনুবাদে প্রথম উদ্যোগী ভূমিকা নেন চার্লস উইলকিনস, যিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কেরানি হিসাবে এদেশে আসেন। উইলকিনস-এর প্রশংসনীয় উদ্যোগের সহায়তা করেন ভারতের বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস। এখন যদিও প্রায় পঞ্চাশোর্ধ বিদেশি ভাষায় গীতার বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। Theory of Relativity লিখে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আইনস্টাইন তখন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ের প্রধান। ভারতের কয়েকজন পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক আপেক্ষিকতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনস্টাইনের সাথে দেখা করতে যান। বলা বাহুল্য, আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিষ্কারের পর পৃথিবীতে মাত্র গুটিকয়েক পদার্থবিজ্ঞানী তাহা বুঝতে পেরেছিলেন। আইনস্টাইন আসলেন এবং সকলকে বিস্ময়াভূত করে সংস্কৃতে প্রশ্ন করলেন—

কিংতে নাম? (তোমাদের নাম কি?)

কথম আগসি? (কোথা হতে এসেছ?)

সাক্ষাৎপ্রার্থী ভারতীয় অধ্যাপকবৃন্দের চক্ষুস্থির, হতবিহ্বল চিত্তে তারা উত্তর দিল :

We don't know how to speak in Sanskrit. (আমরা সংস্কৃতে কথা বলতে জানি না ।) Please speak with us in English. (অনুগ্রহপূর্বক আমাদের সাথে ইংরেজিতে কথা বলুন ।)

আইনস্টাইন ঝড়ের বেগে ক্ষীপ্ত হয়ে বললেন, What! You say you are Indians. But you can not speak in Sanskrit. (কি! তোমরা বলছ তোমরা ভারতীয়, কিন্তু সংস্কৃত জান না ।)

উত্তরে ভারতীয়রা বলল, Sanskrit is a dead language in our country. It is used only in ancestral Functions. (সংস্কৃত হল আমাদের দেশের একটি প্রাণহীন ভাষা । কেবল শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে ইহা ব্যবহার করা হয় ।) আইনস্টাইন তেলে-বেগুনে জ্বলে রুদ্র মূর্তি ধারণ করলেন এবং বললেন, Who says Sanskrit is the dead language? It is the sole living language in the world. (কে বলে সংস্কৃত প্রাণহীন ভাষা? পৃথিবীতে একমাত্র জীবন্ত ভাষা হল সংস্কৃত ।)

তারপর আইনস্টাইনের বক্তব্য নিম্নরূপ :

"আমি ইংরেজিতে অনুবাদ করা গীতা পড়তে পড়তে অবাক হয়ে যাই, আত্মস্থ হয়ে পড়ি এবং এই আত্মস্থ অবস্থায় পদার্থবিজ্ঞানের অতি দুর্বোধ্য আপেক্ষিকতত্ত্ব আমার কাছে সূর্যের আলোর মত সহজ সরল হয়ে যায়, সকল জটিল তত্ত্ব হয়ে যায় সরল ।"

আইনস্টাইন আরও বলেন— "আমি দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে চাই না । সংস্কৃত অক্ষরে লেখা মূলগ্রন্থ পাঠের জন্য আমি নিজে সংস্কৃত বর্ণমালা, সংস্কৃত ব্যাকরণ আয়ত্ব করি । আমার উপলব্ধি হল, "অমৃতং মধুররং সম্যক, সংস্কৃতং হি ততোধিকম॥" যতদিন বিন্ধ্যহিমাচল পর্বত থাকবে দণ্ডায়মান, যতদিন গঙ্গা, কাবেরী, গোদাবরী রবে বহমান ততদিন সংস্কৃত থাকবে দীপ্তিমান ।" ভারতীয় পদার্থবিদরা লজ্জায় মাথা নত করে রইল । অনুধাবন করতে পারল ভারতীয় সংস্কৃত ভাষা এবং গীতা গ্রন্থ কত প্রভাবশালী এবং সমৃদ্ধ ।

যে পত্রিকা থেকে এই চটকদার খবরটি তুলে ধরলাম, সেটা ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক 'হরেকৃষ্ণ সমাচার' (১৪ বর্ষ॥ ৭ম সংখ্যা॥ এপ্রিল ২০০৬ ইং॥ চৈত্র ১৪১২ বৈশাখ ১৪১৩॥); আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ-ভাবনামৃত সংঘ (ইসকন)-এর মুখপত্র । মাসিক পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে নাম উল্লেখ আছে আচার্যঃ শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ; এবং বর্তমান সম্পাদক ও প্রকাশক হিসেবে লিখিত আছে শ্রী চারুচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী'র নাম ।

কলেজে পড়ার সময় এক স্যার আমাদের প্রায়ই বকা দিয়ে বলতেন : "যারা গাধাকে ঘোড়া বলে, তারা গাধা চিনে না, ঘোড়াও চিনে না ।" আর পত্রিকাটির খবর পড়ার পর আমার মনে হল, যারা ধর্মকে (Religion) বিজ্ঞান বলে দাবি করেন, তারা বিজ্ঞান বোঝেন না, ধর্মও বোঝেন না । বোঝেন শুধু নিজেদের আখের গোছানো! লেখাটি পড়ে কয়েকটি প্রশ্ন তৎক্ষণাৎ মাথায় উদয় হয়—(১) এই লেখায় কোনো লেখকের নাম উল্লেখ নেই কেন? যদিও পত্রিকার বাকি সব লেখায় লেখকের নাম উল্লেখ আছে । (২) এই লেখার কোনো তথ্যসূত্র বা উৎস উল্লেখ নেই কেন? কিংবা কোথা হতে লেখক এই ধরনের অবিশ্বাস্য তথ্য পেলেন? (৩) যে কয়েকজন পদার্থবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন দাবি করা হচ্ছে, তাঁদের নামও লেখায় উল্লেখ নেই, কেন? (৪) কবে ঐ বিজ্ঞানীরা আইনস্টাইনের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন? (৫) লেখক কী কৌশলে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার সূত্র, ভারতীয়রা গীতা'র চর্চা করে বলে বুঝতে পেরেছিলেন; অথচ ওনার বক্তব্য মতে ভারতীয় পদার্থবিদরা সংস্কৃত ভাষা জানতেন না, এটা কি স্ববিরোধী হয়ে গেল না? (৬)

শ্রীমদ্ভগবদগীতা'কে লেখক কি বিজ্ঞানের কোনো বই (পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ইত্যাদি) হিসেবে ভাবছেন, না-কী একে তিনি শুধুই একটি 'ধর্মগ্রন্থ' (যেমন : তোরাহ, কোরান, বাইবেল, ত্রিপিটক) বলে ভাবছেন? না-কী ভাবছেন আবার এই দুটির 'হাঁস-জারু' মার্কা সন্নিবেশ বলে?

বিজ্ঞান আজ অস্বাভাবিক গতিতে অপ্রতিরুদ্ধ; আর আজকের আধুনিক যুগে ধর্মের বাণীগুলো কেমন যেন বোকা-বোকা ধরনের কথাবার্তা বলেই মনে হয়। বোঝাই যায়, এখন বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের মেল ঘটাতে না পারলে যে, পাবলিককে গেলানো যাবে না? আর পাবলিক না খেলে যে—স্বামীজি, বাবাজি, মাতাজিদের তল্পিতল্পা বেঁধে লাইটপোস্টের নিচে থালা হাতে বসে থাকতে হবে! তাই বোধহয় এরকম অক্লান্ত সাধু প্রচেষ্টা!

পাঠক, এই বিষয় নিয়ে লেখার কোনো ইচ্ছে ছিল না আমার; কিন্তু চারিদিকে ইসলামি মৌলবাদ নিয়ে ডামাডোলের ফাঁক দিয়ে কী করে হিন্দু মৌলবাদ বিস্তৃত হচ্ছে, এটা তুলে ধরার জন্যই লেখাটির অবতারণা। 'ইসকন' (International Society for Krishna Consciousness, ISKCON) দীর্ঘদিন ধরে আমাদের দেশে বিশাল আঙ্গিকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, অপবৈজ্ঞানিক জ্ঞান, সময়ে-সময়ে সম্পূর্ণ মিথ্যা তথ্য প্রচার করে আসছে। প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে রাখি, ইসকন থেকে প্রকাশিত কয়েকটি বই আমার সদ্য পাঠের সুযোগ হয়েছে; বইগুলো পাঠ করে আমার তো চক্ষু চড়াকগাছ! আজকের যুগে বিজ্ঞানের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেও আধুনিক বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকদের অকথ্য-অশ্লীলভাষায় গালাগালি করা সম্ভব, তা ইসকনের গ্রন্থগুলি পাঠের আগে জানা ছিল না! ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য স্বামী প্রভুপাদ (১৮৯৬-১৯৭৭) ও তাঁর শিষ্যদের ভাষায়, বর্তমানকালের বিজ্ঞানের দর্শন হচ্ছে 'কূপমণ্ডুক দর্শন', বৈজ্ঞানিকেরা হচ্ছে মহামূর্খ, নির্বোধ, ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর করা কতগুলি কুয়োর ব্যাঙ, বিকৃত মস্তিষ্কধারী, কুকুর, শূকর, উট, গাধার থেকে কোনো অংশে উন্নত নয়, তারা বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে চাচ্ছে! ইসকনের গুরু ও শিষ্যদের মারাত্মক অভিযোগ : আধুনিক বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিকেরা কেন ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, ভগবানকে নিয়ে গবেষণা করেন না, আত্মার অস্তিত্ব মেনে নেন না, বেদ-গীতার বক্তব্যে আস্থা রাখেন না, বেদ-গীতাসহ অন্যান্য হিন্দুধর্মীয় পুস্তককে কেন বিজ্ঞানের গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন না? বাহ! মামা বাড়ির আবদার পেয়েছেন মনে হয়! বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সম্পর্কে ইসকনের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমার বক্তব্যে যদি কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ বা সংশয় থাকে, তবে একটু কষ্ট করে হলেও ইসকন কর্তৃক প্রকাশিত জীবন আসে জীবন থেকে, কৃষ্ণভক্তি সর্বোত্তম বিজ্ঞান গ্রন্থ দুটি পাঠ করে নিবেন। একবার চোখ বুলালেই লক্ষ্য করবেন উক্ত গ্রন্থ দুটির পাতায় পাতায় একদিকে বিজ্ঞানের কী তীব্র বিরোধিতা, অপব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে আবার অন্যদিকে বিজ্ঞানের স্বীকৃতি পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা! কোথাও স্ববিরোধী বক্তব্য আবার কোথাওবা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-কার্যপ্রণালী সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞানের অভাব! এখানে আলোচনার পরিসর সীমিত রাখার স্বার্থে মাত্র দুটি উদাহরণ তুলে ধরছি আমার বক্তব্যের সমর্থনে : জীবন আসে জীবন থেকে গ্রন্থের ১৪-১৫ পৃষ্ঠায় বিশ্বের সবচেয়ে দামি এবং মর্যাদাপূর্ণ নোবেল পুরস্কার সম্পর্কে কটাক্ষ করে বলা হয়েছে 'গর্দভের নোবেল পুরস্কার', নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানীরা নাকি বিকৃতমস্তিষ্কধারী, কুকুর, শূকর, গাধা আর নোবেল কমিটির সদস্যরা পশুর থেকে উন্নত নয়, এক নম্বরের মূর্খ! ইসকন গুরু প্রভুপাদ 'নোবেল পুরস্কার' নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এভাবে, "একটি পশু আর একটি পশুর স্তব করছে, এতে কি কৃতিত্ব রয়েছে?..."! কৃষ্ণভক্তি সর্বোত্তম বিজ্ঞান গ্রন্থেও (পৃষ্ঠা ৫৬-৫৯) নোবেল পুরস্কার নিয়ে একই বক্তব্য রয়েছে : 'মূর্খদের জন্য নোবেল পুরস্কার'! অথচ সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ও মজার বিষয় হচ্ছে (নোবেল পুরস্কার নিয়ে এতো কুৎসিৎ গালাগালির পরেও) কৃষ্ণভক্তি সর্বোত্তম বিজ্ঞান গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ১৮৭) শ্রীল প্রভুপাদ ও তাঁর বান্দারা লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে জোর দাবি জানিয়েছেন, 'ভগবানকে নোবেল পুরস্কার দিন'!! আঃ মরি! মরি! ভণ্ডামি আর স্ববিরোধিতার চমৎকার মেলবন্ধন! এবার চলুন জড়বস্তু সম্পর্কে বিশ্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী শ্রীল প্রভুপাদ এবং তাঁর বান্দার 'বিশেষ জ্ঞান' পাঠ করি : শ্রীল প্রভুপাদ বলেন (জীবন আসে জীবন থেকে, পৃষ্ঠা ৪), "সমস্ত জড় বস্তুই হচ্ছে পাঁচটি স্থূল পদার্থ (মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ) এবং তিনটি

সূক্ষ্ম পদার্থ (মন, বুদ্ধি এবং অহংকার)-এর সমন্বয়" । এরপর প্রভুপাদের যোগ্যশিষ্য করন্ধর বলেন, "বৈদিক জ্ঞান অনুসারে জড়শক্তির প্রথম প্রকাশ হচ্ছে অহংকার । তারপরে তা বুদ্ধিতে পর্যবসিত হয়, তারপরে মনে এবং তারপর আকাশ, বায়ু, আগুন, জল এবং মাটি এই স্থূল উপাদানগুলিতে রূপান্তরিত হয় । এই সবকটি মৌলিক উপাদান দিয়েই জড় জগতের সৃষ্টি হয়েছে... ।" পাগলের প্রলাপ দেখে কি বলবো বলুন? মৌলিক পদার্থের সংজ্ঞাই যারা জানে না, কোনগুলো মৌলিক পদার্থ, কোনগুলো নয়, তার নামই যারা জানে না, বস্তুর গঠন-ধর্ম নিয়ে যাদের সামান্য নবম-দশম শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞান-রসায়নবিজ্ঞানের জ্ঞানটুকু নেই, তাঁরা এসেছে নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানীকে সবক দিতে! হায়রে কপাল! একেই বলে বোধহয় কলিকাল! ওনাদের তো নোবেল প্রাইজ দেয়া উচিৎ! কী বলেন? মজার বিষয় তাঁরাও সেরকম দাবি করেছেন কৃষ্ণভক্তি সর্বোত্তম বিজ্ঞান গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ১৮৯)! বিজ্ঞান নিয়ে ইসকনের এ অপকাণ্ড দেখে আমার কবি জীবনানন্দ দাশের ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে : "অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ, যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা"!

ইসকনের কর্মকাণ্ড, স্ববিরোধী বিজ্ঞান-বিরোধিতা, অপব্যাখ্যা, ধর্মাশ্রয়ী ছদ্মবিজ্ঞানের অপতৎপরতা নিয়ে আলোচনা এখানে আর নয়; পরবর্তীতে স্বতন্ত্র আরেকটি প্রবন্ধে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে আলোচনা করা হবে । যা হোক, ইসকনের কয়েকজন স্থানীয় সদস্যের সাথে কথা বলে জানা গেছে, বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই (যেসব অঞ্চলে হিন্দু মন্দির রয়েছে) তাদের শাখা রয়েছে । তারা সেখানে ত্রৈমাসিক-মাসিক পত্রিকাসহ বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় বই-পুস্তক, ধর্মীয় ছবি-পোস্টার, লিফলেট, পূজার বিভিন্ন উপকরণ, প্রসাদ ইত্যাদি হিন্দুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিক্রি করেছে । এছাড়া নাম-সংকীর্তনের আড়ালে উগ্র হিন্দুত্ববাদের প্রচার তো চলছেই! দেশের অনেক অঞ্চলে আপাত 'নিরীহ' ধরনের ('সংখ্যালঘুদের ধর্মচর্চা করার স্বাধীনতা'র সুযোগে!) মন্দির তৈরি করে ভগবদ্গীতা থেকে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের বাণী প্রচার করা হচ্ছে! ধর্মের তথাকথিত শান্তির বাণী প্রচারের নামে আমাদের অল্পশিক্ষিত, অশিক্ষিত নিরীহ-নিরন্ন মানুষের 'অজ্ঞতা-অসহায়ত্ব'কে নিয়ে বেওসা হচ্ছে! কারণ এ বিষয়টি পাবলিক খায়ও ভালো! পাবলিককে খাওয়ানোর তাঁদের এ নিরন্তর অপচেষ্টার আসল উত্তর পাওয়া যায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাশিয়ার চিঠি গ্রন্থের ৭নং চিঠির কিছু উক্তির মধ্যে; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন : "এ পর্যন্ত দেখা গেছে, যে রাজা প্রজাকে দাস করে রাখতে চেয়েছে সে রাজার সর্বপ্রধান সহায় সেই ধর্ম যা মানুষকে অন্ধ করে রাখে । সে ধর্ম বিষকন্যার মত : আলিঙ্গন করে সে মুগ্ধ করে, মুগ্ধ করে সে মারে । শক্তিশেলের চেয়ে ভক্তিশেল গভীরতর মর্মে গিয়ে প্রবেশ করে, কেননা তার মার আরামের মার ।" এই 'আরামের মার' দেওয়ার জন্য শুধু ইসকনই নয়, এ দেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন, অনুকূল আশ্রম, লোকনাথ আশ্রম ইত্যাদি বিচিত্র নামধারী আশ্রম, কিংবা সাধকপুরুষ-মহাপুরুষের দল দীর্ঘদিন ধরে অপবৈজ্ঞানিক-বিজ্ঞানবিরোধী মৌলবাদী চিন্তা-ধ্যান-ধারণা কৌশলে লোক ঠকিয়ে বিক্রি করছে । এঁদের কাজ কারবার দেখে মনে হয় 'মিথ্যার বেসাতির' এক মহোৎসব চলছে এ দেশে । এসব দেখার কেউ নেই, কোনো প্রশ্ন করার কেউ নেই, বাধা দেয়ার কেউ নেই...!

শ্রীমদ্ভগবদগীতার অতীত অনুসন্ধান : এ প্রবন্ধের মূল বিষয় হচ্ছে ভগবদ্গীতা; সঠিকভাবে বলতে গীতায় বিজ্ঞান অন্বেষণ! অনেকদিন ধরেই হিন্দুত্ববাদীদের কাছ থেকে এরকম দাবি শুনে আসছি যে, গীতা হচ্ছে স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা সর্বজ্ঞানের আকর গ্রন্থ, বিজ্ঞানময় গ্রন্থ! আজকে সেই পবিত্র গীতাকে স্বল্প পরিসরে হলেও একটু বিশ্লেষণ করে হিন্দুত্ববাদীদের দাবির যথার্থতা যাচাইয়ের চেষ্টা করবো । গীতাকে নিয়ে আলোচনায় যাওয়ার আগে অবশ্যই সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গীতার অতীত ইতিহাস জানতে হবে । কারণ, ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনায় গেলে গীতাকে ভগবানের মুখঃনিসৃত বাণী ভেবে শুধু একের পর এক কথার ফুলঝুরিই সৃষ্টি হবে, গীতা রচনার সামাজিক প্রেক্ষাপট বুঝা যাবে না । আমার জানা মতে, বাঙলা ভাষায় হিন্দুধর্মের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ যেমন রামায়ণ, মহাভারতসহ ভগবদ্গীতা নিয়ে সমাজবিজ্ঞানের আলোকে অত্যন্ত গবেষণাধর্মী দুটি গ্রন্থ (মহাকাব্য ও মৌলবাদ, সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবদ্গীতা) রচনা করেছেন ভারতীয় বিদগ্ধ লেখক জয়ন্তানুজ

বন্দ্যোপাধ্যায়; স্বীকার করে নিচ্ছি, বাঙলাভাষায় এর থেকে বিশ্লেষণধর্মী ও মননশীল গ্রন্থ এখনো আমার নজরে আসেনি। ফলে এ প্রবন্ধে ভগবদ্গীতার অতীত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমার মূল উপজীব্যই জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থ দুটি। আমি মনে করি, ভগবদ্গীতা (এমন কী রামায়ণ-মহাভারত) সম্পর্কে আরো বিস্তৃত পরিসরে সমাজবৈজ্ঞানিক দৃষ্টি থেকে জ্ঞান আহরণ করতে চাইলে উক্ত গ্রন্থ দুটি পাঠ একান্ত আবশ্যিক। এবার মূল আলোচনায় আসি, ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি প্রায় সব হিন্দু বাড়িতে শ্রীমদ্ভগবদগীতা অত্যন্ত যত্নসহকারে পবিত্রভাবে আলাদা করে তুলে রাখেন। যেমনটি কোরান, বাইবেলকে যত্নে রাখেন ইসলাম, খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা। অনেক হিন্দু আছেন, সকালে গীতা পাঠ ছাড়া কোনো ধরনের খাদ্য পর্যন্ত গ্রহণ করেন না। গীতাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিসৃতঃ বাণী ভেবে পূণ্যলাভের জন্য যা যা করা দরকার, তার সবই তারা করেন। অন্ধবিশ্বাসী হিন্দুদের এই অন্ধ-আবেগকে পুঁজি করে বিচিত্র সব নামধারী শতশত 'মানসিক রোগী থেকে শুরু করে বুজরুক' বাবাজি-মাতাজি-ঠাকুরজি নিজেদের অন্ন-রুটির যোগান করছেন। স্বর্গলাভের মুলো ঝুলিয়ে নিরন্ন মানুষের মুখের আহার কেড়ে নিয়ে নিজেদের উদরপূর্তি করতে এঁরা এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করেন না। সৌম্য দর্শন আর সেবাপরায়ণ মুখোশের আড়ালে কী বিভৎস লাম্পট্য আর ভণ্ডামি তাঁদের মধ্যে বিরাজ করছে, তা দেখলে শরীর রি রি করে উঠে!

শ্রীমদ্ভগবদগীতাকে অনেকে ভগবদ্গীতা আবার শুধু গীতাও বলে। বর্তমানে প্রচলিত মহাভারত পাঠ করলে দেখা যায়, গীতার রচনার প্রেক্ষাপট হচ্ছে এ রকম : কৌরব আর পাণ্ডবদের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুন নিজের আত্মীয়স্বজনদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে বলে যুদ্ধ বিমুখ হয়ে পড়েন। অর্জুনকে যুদ্ধে নিয়োজিত করতে শ্রীকৃষ্ণ অনেক যুক্তি-তর্কের আশ্রয় নেন। এই ধরনের যুক্তি-তর্কে শ্রীকৃষ্ণ যা বলেন, তাই গীতার বিষয়বস্তু। গীতায় লক্ষ্য করা যায় যে, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বিভিন্ন নামে ডাকছেন, যেমন—হৃষিকেশ, মধুসূদন, জনার্দন, বার্ষ্ণেয়, গোবিন্দ, অরিসূদন, কেশব ইত্যাদি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন কিছু বলছেন, তখন বলা হচ্ছে 'শ্রীভগবান উবাচ'। এ কারণেই হয়তো গীতাকে ভগবদ্গীতা বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান দ্বারা যা গীত হযেছে। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে (১২৩টি অধ্যায়ের মধ্যে) ২৫-৪২ পরিচ্ছেদের ১৮টি অধ্যায়ে বর্তমানে প্রচলিত গীতা। এই আঠারোটি অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে সর্বমোট ৭০০টি শ্লোক। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে ভগবদ্গীতা আরম্ভ হবার পূর্বে ২৪টি এবং ভগবদ্গীতা শেষ হবার পরে আরো ৮১টি অধ্যায় রয়েছে। আপাত ধরে নেয়া যাক, মহাভারতের ভীষ্মপর্বেই সর্বপ্রথম গীতার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। আজকের এ প্রচলিত গীতাকে সর্বপ্রথম শঙ্করাচার্য-ই (৭৮৮-৮২০) মহাভারত থেকে বিছিন্ন এবং স্বাধীন-স্বতন্ত্র ধর্মগ্রন্থরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন; শঙ্করাচার্যের পূর্বে গীতা রচিত হবার পর মূলতঃ মহাভারতের সাথেই অঙ্গীভূত ছিল, তাই স্বতন্ত্র-স্বয়ংসম্পূর্ণ ধর্মগ্রন্থরূপে এর কোনো স্বীকৃতি ছিল না। পাঠক এখানে গীতাভাষ্যকার শঙ্করাচার্য সম্পর্কে একটি তথ্য আপনাদের জানিয়ে রাখি : (স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বাস মতে কৃষ্ণ পরবর্তী বিষ্ণুর অবতার!) শঙ্করাচার্য যখন নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে গীতাভাষ্য রচনা করেন, তখন তিনি উপক্রমণিকায় (ভূমিকা/মুখবন্ধ) যুক্তি হাজির করেন, "... গীতাশাস্ত্র সমস্ত বেদার্থের সারসংগ্রহ স্বরূপ, এবং এর অর্থ বোঝা অত্যন্ত কঠিন। এর অর্থ আবিষ্কার করবার উদ্দেশ্যে অনেকে এর পদ, পদার্থ, বাক্যার্থ এবং যুক্তি বিবৃত করলেও লোকে সেসব অত্যন্ত পরস্পরবিরোধী অনেক অর্থে গ্রহণ করে থাকে, এই উপলব্ধি থেকেই আমি এর বিবেকসম্মত অর্থ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে সংক্ষেপে এর বিবরণ দিচ্ছি।" কিন্তু শঙ্করাচার্যের দাবি মতো পূর্ববর্তী কোনো গীতাভাষ্যের সন্ধান পাওয়া যায়নি; আর ভুল-পরস্পরবিরোধী অর্থ বা ব্যাখ্যা তো অনেক পরের কথা! কিংবদন্তীতে এক সময় শঙ্করাচার্যের পূর্বে 'বৌধায়নের গীতাভাষ্যের' কথা শোনা যায়, কিন্তু এরকম কোনো গীতাভাষ্যের অস্তিত্ব বাস্তবে কখনো প্রমাণিত হয়নি। অতএব, শঙ্করাচার্যই যে সর্বপ্রথম মহাকাব্য মহাভারত থেকে গীতাকে আলাদা করে 'গীতাশাস্ত্র'রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন, গীতাবিশেষজ্ঞরা এই সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। স্বাভাবিকভাবেই তাহলে যে প্রশ্নটি দেখা দেয়, পল্লবিত মহাভারতে গীতা সংযুক্ত হবার এত কাল পরে কেন শঙ্করাচার্য মহাভারত থেকে গীতাকে আলাদা করে স্বয়ংসম্পূর্ণ ধর্মগ্রন্থরূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন, আর নিজের দাবি

মত 'বিবেকসম্মত ভাষ্য' তৈরি করে তার মাধ্যমে 'ভগবান নির্দিষ্ট ধর্ম' প্রচার করলেন? এই প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে, আমাদেরকে একটু অতীতে যেতে হবে। ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, শঙ্করাচার্যের সময়কালে (নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে) কিংবা তারও আগে এ অঞ্চলের ব্রাহ্মণ্যধর্মের (বর্তমানের হিন্দু ধর্ম) সামনে বৌদ্ধধর্ম একটি বিশাল চ্যালেঞ্জরূপেই দেখা দিয়েছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের কুৎসিৎ চাতুর্বর্ণ প্রথা-নিয়মনীতি, নারী ও শূদ্রদের প্রতি মনুবাদীদের নৃশংস ও বীভৎস আচরণে অতিষ্ঠ, সেকালে বৌদ্ধ-জৈনধর্মের উদার-মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, বিশেষ করে বৌদ্ধধর্মের পরিচ্ছন্ন রীতিনীতি, বর্ণশ্রমের কঠোর বিরোধিতা, বস্তুবাদী জ্ঞানচর্চার প্রতি আকর্ষণ, গণমানুষকে বিপুল পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল। দলে-দলে শূদ্র-বৈশ্য ধর্মান্তরিত হয়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে লাগল। সমাজের নিপীড়িত শ্রমিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি উল্টোমুখ হওয়াতে সমাজের শোষকশ্রেণী ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সামনে মারাত্মক অস্তিত্বের সংকটরূপে দেখা দেয়। আবার গুপ্তযুগে এবং তার পরে হিন্দুধর্মের অভ্যন্তরে বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রবল হয়ে উঠেছিল এবং এই সমস্যার একটি সমন্বয়ধর্মী সমাধান প্রয়োজন ছিল। এতো গেল স্থানীয় সমস্যা, এছাড়া পঞ্চম শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত বিদেশী হুন আগ্রাসন উত্তর ভারতকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল; গুপ্ত ও পাল রাজারা শেষ পর্যন্ত হুন আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারলেও এরা বিশাল সংখ্যায় ভারতে বসতি স্থাপন করে রাজপুত জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মের 'গুদের উপর বিষফোড়া' হিসেবে দেখা দেয়। এছাড়া সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে আরবেরা সিন্ধুদেশ দখল করে নিয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সমাজের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর সামনে মস্ত বড় বিপদ সংকেত হিসেবে আবির্ভূত হয়। তৎকালীন ভারতের ভিতর-বাহিরের এ অস্থিতিশীল অবস্থা ব্রাহ্মণ্যধর্মকে 'আত্ম-পরিচয়ের সংকটে' ঠেলে দেয়। ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের এ সংকটময় অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ দর্শন, মহাভারত থেকে গীতাকে আলাদা করে স্বতন্ত্র ধর্মগ্রন্থরূপে উপস্থাপন-প্রচার, ধর্মীয় ভক্তি-আন্দোলন—দুর্দশাগ্রস্থ বাস্তব পরিস্থিতিকে আড়াল করে একটি জাগতিক সমাধান সূত্র ও 'ঈশ্বরভক্তিতে মুক্তি'র অলীক প্রেরণা হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছিল। আর এই মুক্তির মূল তাত্ত্বিক প্রেরণা আবার আসে ভগবদ্গীতা থেকে! এছাড়া আমরা দেখি, শঙ্করাচার্য ব্রাহ্মণ্যধর্মের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক আদর্শকে শক্তিশালী করার জন্য, বদরী, দ্বারকা, পুরী এবং শৃঙ্গেরীতে হিন্দুধর্মের চারটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন, শঙ্করাচার্যের পরম্পরা সৃষ্টি করেন, সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে পুনর্গঠিত করে হিন্দুধর্মকে এক সর্বভারতীয় সাংগঠনিক রূপ দান করেন। প্রধানত শঙ্করাচার্য এবং তাঁর অনুগামী ভক্তদের ধর্মীয় এবং সাংগঠনিক তৎপরতার ফলেই শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়, নির্বিশেষে হিন্দুধর্ম শক্তিশালী হয়ে ওঠে, আর দশম শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধধর্ম কার্যত হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় (দ্রষ্টব্য : সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবদ্গীতা, পৃষ্ঠা ২০)।

গীতার রচয়িতা কে তা অজানা; যেমন জানা যায় না প্রাচীন ভারতীয় অনেক লোকগাঁথা আর ধর্মীয় পুস্তক (বৌদ্ধ ধর্মের জাতক কাহিনী, উপনিষদ ইত্যাদি) রচয়িতার নাম। তবে গীতার অনেক ভাষ্যকার রয়েছেন; রয়েছে তাঁদের সম্পাদিত নানা ধরনের টীকা। বস্তুত টীকা ছাড়া গীতা বোঝা খুবই কঠিন। গীতার নানা ভাষ্যকার, যার-যার বিশ্বাসমতো গীতার ভাষ্য লিখেছেন, ফলে এঁদের টীকা পড়লে বিভিন্নজনের বিভিন্ন মতের চাপে একজন পাঠকের বিভ্রান্ত হওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। গীতার ভাষ্যকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন শঙ্করাচার্য, রামানুজাচার্য, শ্রীধরস্বামী মাধবাচার্য, বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রমুখ। বিদেশি ভাষাতে গীতা অনুবাদের মধ্যে ১৭৮৫ সালে সর্বপ্রথম ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংসের ভূমিকাসহ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কেরানি চার্লস উইলকিন্স; এরপর ১৭৮৭ সালে নভিকভের রুশ অনুবাদ প্রকাশিত হয়। জার্মান পণ্ডিত শ্লেগেলের লাটিন অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮২৩ সালে। ১৮২৫ সালে ইউজেন বুর্নক ফরাসি ভাষায়, ১৮৫৮ সালে ডেমোট্রিয়ার গ্রিক ভাষায়, ১৮৬৯ সালে এফ. লরিনসারের জার্মান ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৮৮৫ সালে আবার এডউইন আরনলডের বিখ্যাত ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৯০৪ সালে অ্যানি বেসান্ত গীতার থিওসফিক্যাল অনুবাদ প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি গীতার সমস্ত শব্দ ইচ্ছেমতো অনুবাদ করে গীতাকে একটি সর্বজনীনরূপ দানের চেষ্টা করেন; উদাহরণস্বরূপ স্বধর্ম অর্থ Duty, স্বভাব অর্থ Law, দেবতা অর্থ Shining One, সত্ত্ব রজ তম গুণের অর্থ

Harmony, Motion ও Inertia আর যক্ষ রক্ষ প্রভৃতি হচ্ছে হারিয়ে যাওয়া আটলান্টিস মহাদেশের বহুগুণসম্পন্ন দৈত্যাকার প্রাণী! আবার বারাণসীর যোগিরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় তান্ত্রিক দেহতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গীতার প্রতিটি শব্দের রূপক অর্থ দানের চেষ্টা করেন; লাহিড়ী মহাশয় নিজের গীতাভাষ্যে গঙ্গা শব্দের অর্থ করেন সুষুম্না, গাণ্ডীব অর্থ মেরুদণ্ড, পাঞ্চজন্য মানে অনাহত শব্দের পাঁচ রকম ধ্বনি, ভীষ্ম মানে ধর্মকর্ম করবার ভয়, পাণ্ডু অর্থ পৃথিবীর পঞ্চতত্থ্য, কুন্তী অর্থ কুণ্ডলিনী শক্তি, অর্জুন মানে জঠরাগ্নি, ভীম মানে প্রাণ বা শরীরের অভ্যন্তরের বায়ু, ইত্যাদি। সাথে-সাথে তিনি এও বলেন, সমস্ত ভগবদ্গীতা কুণ্ডলিনী শক্তির শূলাধার চক্র থেকে সহস্রার চক্রে উথ্থানের রূপক মাত্র! এ বিষয়টি হয়তো অনেকে জানেন, ভারতবর্ষে বিট্রিশ শাসনামলে 'গীতার ধর্মযুদ্ধ ও কর্মযোগের তত্ত্বকে' হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও সশস্ত্র বিপ্লবের তাত্ত্বিক বুনিয়াদ হিসেবে ব্যবহারের প্রয়াস চালান বঙ্কিমচন্দ্র, মহাত্মা গান্ধী, বিবেকানন্দ, বিপিন চন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, বাল গঙ্গাধর তিলকসহ প্রমুখ (দ্রষ্টব্য : সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবদ্গীতা, পৃষ্ঠা ২৪-২৭)। এজন্য বিট্রিশরা গীতাকে 'সন্ত্রাসে প্রেরণাদানকারী' গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করতো এবং গীতা বহন, পাঠের অভিযোগে নানাজনকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়ে গ্রেফতার করতো কোনো কারণ ছাড়াই। বর্তমান সময়ে অনেক হিন্দু বা নন-মুসলিমদের সাথে আলাপে দেখেছি, তারা ইসলামধর্ম ও কোরানশরিফ নিয়ে বেশ চিন্তিত এবং আতঙ্কিত! তাঁদের মতে, ইসলামি জেহাদিরা কোরানশরিফের কিছু 'উত্তেজক' আয়াত (যেমন, ২:১৯১-১৯৩, ২:২১৬, ৩:৮৫, ৯:৩৯, ৯:৭৩ ইত্যাদি) থেকে 'জেহাদ' সম্পর্কে আল্লাহতায়ালার সুনির্দিষ্ট নির্দেশ পেয়ে পৃথিবীটাকে 'দারুল-ইসলাম' বানানোর জন্য ননমুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, আত্মঘাতী বোমাহামলা করছে! পশ্চিমাদেশে কেউ কেউ একে নাম দিয়েছেন 'ইসলামফোবিয়া'! কোরানশরিফ সম্পর্কে বর্তমানকালের সনাতন হিন্দুধর্মাবলম্বীদের এহেন আচরণে মনে হয়, 'যত দোষ নন্দ ঘোষ'! তাঁদের নিজেদের ধর্মগ্রন্থ (গীতা) একদম শান্তিবাদী, মানবতাবাদী, গণমানুষের কল্যাণকামী! অথচ ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্যযোগ পাঠ করলেই দেখা যায়, এর পাতায়-পাতায় শত্রুবিনাশের লক্ষ্যে 'ধর্মযুদ্ধ' চালিয়ে যাওয়ার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ-উপদেশ (২:২১) : "যিনি আত্মাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ, অব্যয় বলে জানেন, হে পার্থ, সে পুরুষ কি প্রকারে কাহাকে হত্যা করেন বা করান? " তার মানে, আত্মা অবিনাশী বলে জানেন যিনি, তিনি মানুষ হত্যা করলেও হত্যাকারী হিসেবে দোষী সাবস্যস্ত হবেন না! বাহ! চমৎকার! পরের শ্লোকগুলিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 'মানুষ হত্যা'র জন্য গোঁজামিল দিয়ে সুন্দর কিছু (কু)যুক্তি উপস্থাপন করেছেন (২:২২-৩১) : "মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন শরীর পরিগ্রহ করে। ... অতএব আত্মাকে এই প্রকার জানিয়া তোমার শোক করা উচিৎ নয়। ... যে জন্মে তাহার মরণ নিশ্চিৎ, যে মরে তাহার জন্ম নিশ্চিত; সুতরাং অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে তোমার শোক করা উচিৎ নয়। ... স্বধর্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াও তোমার ভীত কম্পিত হওয়া উচিৎ নয়। ধর্মযুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয় আর কিছুই নেই।" এর পরের শ্লোকে ভগবান ঘোষণা করেন, "ধর্মযুদ্ধ না করলে স্বধর্ম ও কীর্তি ত্যাগ করিয়া তুমি পাপযুক্ত হইবে (২:৩৩), সকল লোকে তোমার অকীর্তি ঘোষণা করিবে, অকীর্তি অপেক্ষা মরণও শ্রেয় (২:৩৪)। আর ধর্মযুদ্ধে মারা গেলে স্বর্গে যাইবে, জয়লাভ করিলে পৃথিবী ভোগ করিবে ...! (২:৩৭) অতএব সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয় তুল্যজ্ঞান করে যুদ্ধের জন্য উদ্যুক্ত হও; এতে পাপভাগী হইবে না" (২:৩৮)। ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে নিজের বিশ্বরূপ প্রদর্শন করে, যুদ্ধের জন্য আবারো প্রণোদিত করতে থাকেন এভাবে (বিশ্বরূপ-দর্শনযোগ, ১১:৩৩-৩৪) : "তুমি যুদ্ধার্থে উত্থিত হও; শত্র জয় করিয়া যশঃ লাভ কর, নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ কর। হে অর্জুন, আমি ইহাদিগকে পূর্বেই নিহত করিয়াছি। তুমি এখন নিমিত্তমাত্র হও। ... যুদ্ধবীরগণকে আমি পূর্বেই নিহত করিয়াছি। এখন তুমি সেই হতগণকে নিহত কর; ভয় করিও না; রণে শত্রুগণকে নিশ্চয় জয় করিতে পারিবে, যুদ্ধ কর।" গীতার সর্বশেষ অধ্যায় মোক্ষযোগ-এ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মানুষ হত্যার লাইসেন্স দিয়েছেন এভাবে (১৮:১৭) : 'আমি কর্তা'—এই ভাব নাই যার (নিরহংকার), যার বুদ্ধি, কার্যে লিপ্ত হয় না, তিনি সমস্ত লোককে হত্যা করলেও কাউকে হত্যা করেন না এবং তার ফলভাগী হন না।" এরপর কী আর

কিছু বলার থাকতে পারে? ভগবানের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলে নিশ্চয়ই গীতার এই শ্লোকের দোহাই দিয়ে নির্দ্বিধায় আইন-আদালত অবজ্ঞা করে যে কেউ (হিন্দুত্ববাদীরা) ভিন্নমতালম্বী-বিরুদ্ধবাদীকে ইচ্ছে মতন দমন করতে পারবে! কারো কিছু বলার থাকবে না!

এখন পাঠক, আপনারাই বলুন উত্তেজক-আক্রমণাত্মক নির্দেশাবলী কি কেবল কোরানশরিফেই আছে? শ্রীমদ্ভগবদগীতাতে নেই? কোরানশরিফে বর্ণিত জেহাদের সাথে গীতার ধর্মযুদ্ধের তফাৎ কোথায়? দুই পক্ষই নিজ-নিজ ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে নিজেদের মতের বিরুদ্ধ মানুষকে (বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী যেই হোক) হত্যা করে 'ধর্মযুদ্ধ' বলে চালিয়ে দিতে চান! একপক্ষ চায় দারুল-ইসলাম, এক পক্ষ চায় ভগবানের দুনিয়া! জানি, এ প্রবন্ধ পাঠ করে সনাতন হিন্দুধর্মালম্বীরা নয়-ছয় করে (যেমনটা ইদানীং মডারেট-মুসলিমরা করে থাকেন) গীতায় বর্ণিত 'ধর্মযুদ্ধের' যৌক্তিকতা (বাস্তব উপযোগিতা) দান কিংবা মিল থাক বা না-থাক ভিন্ন অর্থ (বা রূপক অর্থ) খোঁজার চেষ্টা করবেন; কিংবা চেষ্টা করবেন মহাভারতের বিশাল গল্পগুলি ফেঁদে ধর্মযুদ্ধের বক্তব্যকে তৎকালীন প্রেক্ষাপটের রচনা বলে চালিয়ে দিতে! কিন্তু নিরেট সত্য হচ্ছে এতে সাময়িক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা ছাড়া আর কোনো লাভই হয় না।

এবার গীতার ধর্মযুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা শেষে অন্য আলোচনায় যাই। গীতাকে অনেক ভাষ্যকাররা (শঙ্করাচার্য) হিন্দুদের আরেকটি ধর্মগ্রন্থ 'উপনিষদ' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু একথা মনে করলে ভুল হবে যে, উপনিষদ বেদান্ত বা বৈদিক সাহিত্যের শেষভাগের অন্তর্গত, ভগবদ্গীতা বুঝি সেই শ্রেণিরই একটি উপনিষদ। প্রকৃতপক্ষে বিশেষজ্ঞরা এবং অদ্বৈত অথবা বেদান্ত দর্শনের প্রবক্তারা গীতাকে উপনিষদ থেকে আলাদা করে দেখেন। তাহলে প্রশ্ন চলে আসে, গীতাকে কেন উপনিষদ বলা হয়? এই প্রশ্নের সহজ উত্তর—গীতা প্রাচীন উপনিষদের অনেক পরবর্তীকালের রচনা হলেও অনেকের মতে এই গীতা উপনিষদের সার সংগ্রহ বিশেষ। পণ্ডিত কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং মনে করেন ভগবদ্গীতার সঙ্গে অন্তত তেরোটি উপনিষদের কোনো না কোনো মিল রয়েছে। ব্রাহ্মণ্যবাদের গুরু স্বামী বিবেকানন্দও এই মত সমর্থন করে বলেছেন—গীতা প্রাচীনতর উপনিষদগুলোর পরবর্তীকালের সংক্ষিপ্ত ভাষ্য বিশেষ। তাঁর মতে—"The Geeta is a Commentary on the Upanishads… The Geeta takes the idea of the Upanishads and in (some) cases the very words. They are strung together with the idea of bringing out, in a compact, condensed and systematic from, the whole subject the Upanishads deal with." (দ্রষ্টব্য : সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবদ্গীতা, পৃষ্ঠা ২৯-৩০)। আবার গীতার অনেক শ্লোক এবং বক্তব্যের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের বিশেষত 'ধম্মপদ' এবং 'সুত্তনিপাত'—এর অনেক অংশের সঙ্গে মিল রয়েছে; কিন্তু এসব গ্রন্থে কিংবা অন্য কোনো প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে গীতার কোনো উল্লেখ নেই। যদিও বৌদ্ধ গ্রন্থগুলিব সঠিক বয়স নির্ধারণ করা কঠিন, তবু মনে করা হয় গ্রন্থগুলি বুদ্ধের সমকালে কিংবা তার অল্প কিছু কাল পরে, অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর বেশ আগেই রচিত।

বর্তমানে প্রচলিত মহাভারত অনুযায়ী গীতা ভীষ্ম পর্বের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অনেক ভারতীয় ঐতিহাসিক, পশ্চিমা পণ্ডিত গীতাকে আদি মহাভারতের অঙ্গ বলে মনে করেন না, বরং পরবর্তীকালের পল্লবিত মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত সংযোজন বলে মনে করেন। এঁদের মধ্যে আছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তিলক, ভাণ্ডাকর, রাধাকৃষ্ণণসহ প্রমুখ ভারতীয়, আর লাসেন, লরিনসার, গারবে, ভ্যান বুইটিনেন প্রমুখ পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞ। ভগবদ্গীতা আদি মহাভারতে ছিল না, পরবর্তীকালে সংযোজন করা হয়েছে, এ সিদ্ধান্তের সপক্ষে তাঁদের কিছু যুক্তি সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবদ্গীতা গ্রন্থ (পৃষ্ঠা ৩১-৩৩) থেকে নিে তুলে ধরা হলো :—

(১) মহাভারতের উপক্রমণিকার সংক্ষিপ্তসারে অথবা আদিপর্বের প্রথমে দেয়া সংক্ষিপ্তসারে গীতার উল্লেখ তো দূরের কথা, কৃষ্ণ ও অর্জুনের মধ্যে কোনো কথোপকথনেরই উল্লেখ নেই। যদিও অনেক তুচ্ছ ঘটনার উল্লেখ

আছে। দুটি সংক্ষিপ্তসারেই আদি মহাভারতে গীতা সংযোজিত হবার আগে রচিত হয়েছিল এবং পরে তা আর সংশোধন করা হয়নি, এ অনুমান যুক্তিসম্মত।

(২) উপরোক্ত দুটি সংক্ষিপ্তসারে, অথবা আদিপর্বের সুদীর্ঘ 'ধৃতরাষ্ট্রবিলাপে' কোথাও 'কুরুক্ষেত্র' শব্দটিই নেই। মনে হয় একটি বড় জ্ঞাতিযুদ্ধের লোকগাঁথা মহাভারতের কলেবর বৃদ্ধির কোন পর্যায়ে কুরুক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল।

(৩) জার্মান পণ্ডিত লাসেন এবং অ্যালব্রেখট্ ওয়েবার, ইংরেজ পণ্ডিত মনিয়ের উইলিয়ামস্সহ অনেক বিশেষজ্ঞ এই বিষয়ে একমত যে, পাণ্ডবেরা সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক কবিকল্পনা মাত্র, এবং যে যুদ্ধের কথা প্রাথমিক পর্যায়ের মহাভারতে ছিল তা প্রকৃতপক্ষে কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ, কুরুপাণ্ডবের নয়। মহাভারতে পাণ্ডব পক্ষের অস্তিত্ব এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুনের মুখ্য ভূমিকা পরবর্তীকালের সংযোজন। বঙ্কিমচন্দ্র পাণ্ডবদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার না করলেও একথা মেনে নিয়েছেন যে, মহাভারতের যুদ্ধ প্রধানত কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ।

(৪) সাংখ্য দর্শন এবং যোগ দর্শনের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে গীতার রচনাকারের পরিচয় ছিল। অথচ এইসব দর্শন গড়ে উঠবার আগেই মূল মহাভারত রচিত হয়েছিল। অতএব গীতার পরবর্তীকালের রচনা এবং পল্লবিত মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত।

(৫) ভাষা ও রচনাশৈলীর বিচারে গীতা মূল মহাভারতের চেয়ে আরও বিবর্তিত, অতএব আধুনিক এবং প্রক্ষিপ্ত।

(৬) মহাভারতের ভীষ্ম পর্বে হঠাৎই ভগবদ্গীতা আরম্ভ হচ্ছে এবং দীর্ঘকাল পরে শেষ হচ্ছে। যুদ্ধের ঘটনা প্রবাহ অকারণে থমকে দাড়িয়ে আছে। গীতা আরম্ভ হবার আগে দু'পক্ষের শংখনাদের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ প্রায় আরম্ভ হয়ে গেছে। আবার আঠারো পরিচ্ছেদের গীতা শেষ হওয়া মাত্রই যুদ্ধ আরম্ভ হচ্ছে। এত দীর্ঘ সময় কৃষ্ণ ও অর্জুন ছাড়া বর্ণিত লক্ষ লক্ষ যোদ্ধা কি করছিলেন তার কোন ব্যাখ্যা নাই। প্রকৃতপক্ষে ঘটনা পরম্পরা, রচনা বিন্যাস, ধৃতরাষ্ট্র-সঞ্জয় সংলাপ এবং সাহিত্যকতার বিচারে মহাভারতে গীতা সংক্রান্ত কিছু না থাকলেও কোন ক্ষতি ছিল না। এই সামঞ্জস্যহীনতা কোন মহাকবির কলমে সম্ভব নয় বলে মনে হয়। মহাভারতের অঙ্গ হিসেবে ভগবদ্গীতার এই সাহিত্যিক অসংগতিটির দিকটি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দৃঢ়তার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেছেন—"...কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ থামিয়ে রেখে সমস্ত গীতাকে আবৃত্তি করা সাহিত্যের আদর্শ অনুসারে নিঃসন্দেহে অপরাধ। ...যখন কুরুক্ষেত্রের তুমুল যুদ্ধ আসন্ন তখন সমস্ত ভগবদ্গীতা অবহিত হইয়া শ্রবণ করিতে পারে, ভারতবর্ষ ছাড়া এমন দেশ জগতে আর নাই।"

(৭) ভগবদ্গীতা শেষ হয়ে যাবার অনেক পরে নবম দিনে যুদ্ধের সময় অর্জুনের আচরণ এবং কৃষ্ণার্জুন সংলাপ গীতা প্রবচনের ঘটনার সঙ্গে সংগতিবিহীন...।

মহাভারতের উপক্রমণিকার (মুখবন্ধ) বক্তব্য অনুযায়ী, ব্যাসদেবের লেখা মহাভারতে প্রথমে মাত্র চব্বিশ হাজার শ্লোক ছিল, এবং তাতে কোন উপাখ্যান ভাগ ছিল না। এরপর ব্যাসদেব নাকি ষাট লক্ষ শ্লোকের এক বিরাট মহাভারত রচনা করেন। এর মধ্যে ত্রিশ লক্ষ শ্লোক দেবলোকে, পনের লক্ষ শ্লোক পিতৃলোকে, আর চৌদ্দ লক্ষ গন্ধর্বলোকে চলে যায়! বাকি এক লক্ষ পৃথিবীতে রয়ে যায়। এই ধরনের 'ঠাকুরমার ঝুলির গল্প' বাদ দিলেও বোঝা যায় যে, প্রাথমিক পর্যায়ের চব্বিশ হাজার শ্লোকের মহাভারত কালক্রমে বিভিন্ন মুনি-ঋষির হাত ধরেই পল্লবিত হতে হতে এক সময় এক লক্ষ শ্লোকের মহাভারত হয়ে উঠে। অবশ্য আরেকটি মত অনুযায়ী, প্রাথমিক পর্যায়ের

আট হাজার শ্লোকের 'জয়' নামক একটি কাব্য পরবর্তীকালের চব্বিশ হাজার শ্লোকের 'ভারত' নামে মহাকাব্যে পরিণত হয়, এবং আরও পরে এই মহাকাব্য এক লক্ষ শ্লোকের মহাভারতে পরিণত হয়। যা হোক, আমরা সে দিকে যাচ্ছি না। এ বিষয়টি হয়তো অনেকে জানেন, তৎকালীন সময়ে মানে খ্রিস্টপূর্ব সময়ে লেখ্যরীতি আবিষ্কারের পূর্বে এবং পরেও দীর্ঘদিন প্রচুর মানুষ বংশপরম্পরায় কোনো ছন্দোবদ্ধ কবিতা, লোককাহিনী, উপাখ্যান কণ্ঠে ধারণ (মুখস্ত) করে রাখতো। বিশ্বের বেশিরভাগ ধর্মগ্রন্থগুলোর ভাষ্য এভাবে মানে সুদীর্ঘকাল বংশপরম্পরাতেই কণ্ঠে ধারণ করা ছিল এবং পরবর্তীতে ক্ষমতাসীন রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় সময়ে-সময়ে লিখিতরূপ পেয়েছে। সাম্প্রতিককালের গবেষকরা এই বিষয়ে একমত যে, আমাদের মহাভারতের মূল কাহিনীও লোকমুখে মোটামুটি খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী থেকে প্রচলিত থাকলেও আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতেই প্রথম লিখিতরূপ নেয়। কিন্তু চারশ বছরের মৌখিক পরম্পরাতেই এর কলেবর অনেক বৃদ্ধি পায়। তারপর আনুমানিক খ্রিস্টাব্দ চতুর্থ শতক পর্যন্ত, এমনকি তারপরেও, মহাভারত আয়তনে অনেক বৃদ্ধি পায়। আর এভাবেই প্রায় বারোশ বছর ধরে অগণিত লেখকের হস্তক্ষেপে চব্বিশ হাজার শ্লোকের আদি মহাভারত প্রায় এক লক্ষ শ্লোকের মহাভারতে পরিণত হয়। (দ্রষ্টব্য : সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবদ্গীতা, পৃষ্ঠা ৩৪-৩৫)

গীতার রচনাকাল সম্পর্কে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ মনে করেন গীতা খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত। পশ্চিমবাঙলার বিদগ্ধ লেখক জয়ন্তানুজ বন্দোপাধ্যায় মনে করেন আদি গীতার রচনাকাল এরকম হলেও মহাভারতের অংশ হিসেবে বর্তমানে প্রচলিত গীতা আরও পরবর্তীকালের সংযোজন। স্বামী বিবেকানন্দ কৃষ্ণ ও যিশুর প্রচলিত জীবনকথা তথা ভগবদ্গীতা ও নিউ টেস্টামেন্টের মধ্যে অনেক মিলের কথা উল্লেখ করেছেন। রিচার্ড গার্বে মনে করেন যে, গীতা রচিত হয় খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিস্টাব্দ দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক রাবার্ট মাইনর এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, ২৫০ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ২৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভগবদ্গীতা রচিত হয়েছিল এবং ১৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল। যদিও তারপরেও মহাভারতের সঙ্গে সঙ্গে গীতার আরও পরিবর্তন হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মত অনুযায়ী মহাভারতের অঙ্গ হিসাবে গীতার জন্মলগ্নে নিঃসন্দেহে খ্রিস্ট পরবর্তীকালে। অধ্যাপক দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বির মতে, 'গীতা জালিয়াতির ফসল', গীতার রচনাকাল কোনোক্রমেই খ্রিস্টাব্দ তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগের আগে হতে পারে না এবং তারপরেই কোনো সময়ে গীতা পল্লবিত মহাভারতে সংযোজিত হয়েছিল। একথাও মনে রাখা দরকার যে, অনেক গবেষক, ঐতিহাসিকের মতে গীতা কোনো একক লেখকের রচনা নয় এবং সেটা অত্যন্ত স্বাভাবিকই; কারণ এতো দীর্ঘকাল (দুইশত, তিনশত বছর কিংবা আটশত বছরই হোক) ধরে নিশ্চয় একজন ব্যক্তির পক্ষে রচনা করা সম্ভব নয়। বর্তমানে প্রচলিত গীতা বহুকাল ধরে অনেক লেখকের রচনা, পরিবর্তন এবং পরিবর্ধনের ফসল। রাজারাম শাস্ত্রী ভাগবতের মতে গীতায় প্রথমে শুধু ষাটটি শ্লোক ছিল। পরবর্তীকালে ছয়টি পর্যায়ে ক্রমশ পল্লবিত হয়ে এটি বর্তমান সাতশ শ্লোকের গীতায় রচিত হয়। ফন হামবোলড্ নামে জার্মান গীতা বিশেষজ্ঞের মত হচ্ছে ভগবদ্গীতা প্রথমে একাদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। বাকি সাত পরিচ্ছেদ পরবর্তীতে যোগ করা হয়েছে। অ্যালব্রেখট ওয়েবার, হলস্টারম্যান, হপকিসন্, জ্যাকবি প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই মতের সমর্থক। জি. এস. খইর নামে একজন ভারতীয় বিশেষজ্ঞ এই মত প্রকাশ করেন যে, বিভিন্ন পর্যায়ে তিনজন লেখক গীতার রচনা করেছেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার (যাকে অনেক গোঁড়া হিন্দু বলে দাবি করেন) মনে করেন ভগবদ্গীতা বেশ কয়েকজন বড় বড় কবি, দার্শনিক এবং ভক্তের রচনার ফসল। ১৯৮৬ সালে মৃত্যুর অল্পকাল আগে অধ্যাপক এ. এল. বেশম এক বক্তৃতামালায় বলেছেন ভগবদ্গীতা তিনটি পর্যায়ে তিনজন লেখক দ্বারা রচিত হয়েছিল্ প্রাথমিক পর্যায়ে প্রথম অধ্যায়ের ৪৭ এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম ৩৮, এই ৮৫টি শ্লোক দিয়ে গীতা রচিত হয়েছিল। এখানে শুধু ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধ করবার দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উপরই গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে একজন বেদান্ত বাদী লেখক অদ্বৈতব্রহ্মের তত্ত্ব যোগ করে কলেবর অনেক বৃদ্ধি করেন। শেষ পর্যায়ে একজন বিষ্ণুভক্ত ঈশ্বরবিশ্বাসী গীতায় বিষ্ণুর অবতারত্ব সংযোজন করেন, আর বাসুদেব কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতাররূপে প্রতিষ্ঠিত

করতে চেষ্টা করেন। আশ্বমেধিক পর্বের অনুগীতার সঙ্গে ভীষ্মপর্বের ভগবদ্গীতার তুলনা করে বেশম এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, অনুগীতা রচনার সময় ভগবদ্গীতায় বিষ্ণু অবতারের কোনো চিহ্ন ছিল না। উল্লেখ যে, বেশমের অনেক আগে এফ. ও. শ্রেডার নামে একজন জার্মান বিশেষজ্ঞ মূলতঃ একই মত প্রকাশ করেছিলেন। (দ্রষ্টব্য : সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবদ্গীতা, পৃষ্ঠা ৩৬-৩৮)

গীতার সময়কাল নির্ধারণের জন্য উপরের এই বিস্তৃত আলোচনা থেকে আমরা ধরে নিতে পারি, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খ্রিস্টাব্দ চতুর্থ শতকের মধ্যে ভগবদ্গীতা পর্যায়ক্রমে রচিত, পরিবর্ধিত এবং মহাভারতে সংযুক্ত হয়েছিল। আর এই সময়টাই ছিল মহাভারতে ব্রাহ্মণ্য সংযোজনের যুগ।

গীতার শ্রীভগবান : গীতাকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা ভগবানের মুখঃনিসৃত বাণী বলে সম্মান করে থাকেন, পূজা করে থাকেন। আর এই ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, যিনি বিষ্ণুর স্বয়ং অবতার, তিনি মহাকাল; তিনি সময়ে সময়ে দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন! ভগবদ্গীতাতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও এমন দাবি করেছেন; দেখুন ৪:৭-৮, ১০:২১, ১১:২৪, ১১:৩০, ১১:৩২। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বিষ্ণু কে? পাঠক, শ্রীকৃষ্ণ কোনো ঐতিহাসিক পুরুষ কী-না বা আদৌ তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন কী-না, আমি সে দিকে যাচ্ছি না। (মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব নিয়ে নানা সন্দেহ ও সংশয় রয়েছে। এ বিষয়ে আগ্রহীরা পড়তে পারেন : মহাকাব্য ও মৌলবাদ, পৃষ্ঠা ৬৮-১০৮) আমরা এখন দেখব, শ্রীকৃষ্ণ যদি সত্যিই জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবুও তিনি 'বিষ্ণু' নামক ভগবানের অবতার হতে পারেন কী-না।

সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ জ্ঞান থেকে আমরা জানি যে, প্রাচীনকালে মানুষের বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাব ছিল। প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ যেমন ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রপাত-বন্যা, দাবানল কিংবা রাতের বেলা চন্দ্রের উদয়, দিনের বেলা সূর্য, জোয়ার-ভাটার খেলা, বছরের নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন ঋতুর চক্রাকারে আগমন ইত্যাদি মানুষকে বিপুল পরিমাণে বিস্মিত করতো; প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মধ্যে 'জীবন' আছে, আস্তে আস্তে এই ধারণাও তাদের মধ্যে কাজ করে, সৃষ্টি করে প্রচণ্ড ভীতির; ফলে সূর্য, চন্দ্র, মেঘ, বিদ্যুৎ, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতিকে বিভিন্ন দেবদেবীরূপে কল্পনা করতো। তেমনিভাবে পৃথিবীতে অগ্নি, জল, মাটি পর্বত, নদী, বন প্রভৃতি অনেক প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যেই দেবদেবীর আধিষ্ঠান কল্পনা করতো; যেমন গ্রিক কিংবা রোমানদের প্রাচীন উপাখ্যান থেকে জানা যায়, তারা সমুদ্রের দেবতা হিসেবে নেপচুন, পৃথিবীর অভ্যন্তরের পাতালের দেবতা হিসেবে প্লুটো এবং আগ্নেগিরির দেবতা হিসেবে ভালকানকে পূজা করতো। মোট কথা হচ্ছে আদিম-অসহায় মানুষ প্রকৃতির এই রূপবৈচিত্র্য সম্পর্কে যৌক্তিক স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে না পেরে 'মানুষের থেকে শক্তিশালী' একাধিক দৈবশক্তির কাজকারবার বলেই ধরে নিত। আর এই দৈবশক্তিকে নিজেদের বশে রাখার উদ্দেশ্যে-তুষ্ট রাখার জন্য (কিংবা অজ্ঞতা, ভয়-ভীতি, কল্পনা থেকেও) প্রার্থনা-উপাসনার সৃষ্টি করে; সৃষ্টি করে বিভিন্ন দেবদেবীর, ঈশ্বরের অস্তিত্বের আর এভাবেই সৃষ্টি হয় ধর্মগুলোর। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক এবং নৃতাত্ত্বিক গবেষণার দ্বারাই এমন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন আধুনিককালের গবেষকেরা। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা তো এখনো শিবলিঙ্গ হিসেবে পাথরকে, গঙ্গা নদীকে দেবী হিসেবে, রামায়ণের কাহিনী থেকে হনুমান বানরকে, কৃষ্ণের বাহন হিসেবে গরুকে, মনসাদেবীরূপে সাপকে পূজা করে! প্রাচীনকালের মানুষের উপাসনার রীতিনীতি আর বিশ্বাস এই আধুনিককালের হিন্দুদের মধ্যেও বর্তমান! যাহোক, সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে মানুষের কাছে সবচেয়ে বিস্ময়কর, শক্তিশালী, এবং সর্বব্যাপী সত্তা ছিল সূর্য, আর তার পরেই ছিল চন্দ্র। বৃহস্পতি, শুক্র, শনি প্রভৃতি গ্রহকেও দেবতা জ্ঞান করা হতো। এর মধ্যে সূর্যের প্রখরতার জন্য তাকে পুরুষ দেবতা এবং চাঁদের স্নিগ্ধতার জন্য তাকে সাধারণত দেবী হিসেবে কল্পনা করা হতো (ব্যতিক্রম হচ্ছে আরবদেশে চাঁদকে পুরুষ দেবতা আর সূর্যকে নারীদেবতা হিসেবে গণ্য করা হত)। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, প্রাচীন মিশরে 'রা' এবং গ্রিসে 'এপোলো' নামে সূর্যকে শ্রেষ্ঠ দেবতা রূপে পুঁজো করা হতো।

ভারতবর্ষেও বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে পৌরাণিক যুগ পর্যন্ত সূর্যকেই প্রধান দেবতা রূপে কল্পনা করা হতো। প্রাচীনকালে গ্রিসে এবং ভারতের অভিজাত শ্রেণী রথে চড়ে যাতায়াত করতেন। তাই এসব দেশে কল্পনা করা হতো যে, আকাশে সূর্যদেবতাও রথে চড়ে যাতায়াত করেন, আর বিভিন্ন দেবতা তার রথের অশ্ব-সারথি ইত্যাদি। আধুনিক যুগেও ভারতে এরকম ধারণা প্রতিষ্ঠিত ছিল; কোণারকের সূর্যমন্দিরসহ ভারতবর্ষের অন্যান্য সূর্যমন্দির তার প্রমাণ। আবার মিশরীয়দের কাছে নীলনদ ছিল যাতায়াত-ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান অবলম্বন। তাই তারা কল্পনা করতো দেবতাশ্রেষ্ঠ সূর্য আকাশ পথে নৌকায় করে যাতায়াত করেন আর বাকি দেবতারা সেই নৌকার মাঝি।

প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে সূর্য আর বিষ্ণুর মধ্যবর্তী সম্পর্ক নিয়ে আমি এবার কিছুটা সংক্ষিপ্তাকারে জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহাকাব্য ও মৌলবাদ গ্রন্থ থেকে তুলে ধরছি। লেখক উক্ত গ্রন্থে বেদ, শতপথ ব্রাহ্মণ, শুক্লযজুর্বেদ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত পুরাণ ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ থেকে বিভিন্ন শ্লোক বা উদ্বৃতি তুলে ধরে স্থির সিদ্ধান্তরূপে দেখিয়ে দিয়েছেন, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে 'সূর্য'কেই দেবতাশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু হিসেবে গণ্য করা হতো। 'বিষ্ণু' শব্দের আক্ষরিক অর্থ (বিষ্ণু = বিস্তার + নু) যার বিস্তার বা ব্যাপ্তিই পরিচয়। পৃথিবী থেকে আপাতদৃষ্টিতে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের দিকে তাকালে মনে হয় সূর্যেরই আছে একমাত্র এই পরিচয়; অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রগুলো সূর্যের পাশে একদম ম্রিয়মাণ। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ২২ সূক্তের ১৬-১৭ ঋকে একই সঙ্গে অশ্বীদ্বয়, সবিতা এবং বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে। এখানে দুটি ঋকে তিন পাদবিক্ষেপে বিষ্ণুর পৃথিবী পরিক্রমার কথা বলা হয়েছে। নিরুক্ত টীকাকার দূর্গাচার্য ব্যাখ্যা করেছেন : "বিষ্ণুরাদিত্যঃ।... সমারোহণে উদয়গিরৌ ঊদ্যন্ পদমেকং নিধত্তে। বিষ্ণু পদে মধ্যন্দিনেহন্তরীক্ষে। গয়শিরস্যস্তং গিরৌ ইতি ঔর্ণবাভ আচার্য্যো মন্যতে।" ভাবার্থ হচ্ছে, সূর্যই বিষ্ণু, তার উদয়কালীন, মধ্যাহ্নকালীন আর অন্তকালীন এই তিন পাদবিক্ষেপ। বিশেষত মধ্যদিনে অন্তরীক্ষে অবস্থিতিই সূর্যের বিষ্ণুত্ব। বিষ্ণুর এই তিন পাদে পৃথিবী পরিক্রমার কথা ঋগ্বেদের আরও কয়েকটি সূক্তে আছে; এগুলো হচ্ছে, ৯/১৫৪/১-৬, ১/১৫৫/৪-৬, ১০/৩৭/৮। এছাড়া ঐ ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ১৫৫ সূক্তের ৫নং ঋকে বলা হয়েছে যে, "মানুষেরা বিষ্ণুর দুই পাদই অবলোকন করতে পারে এবং ধারণা করতে পারে। তৃতীয় পাদ মানুষেরা ধারণা করতে পারে না, এমনকি উড্ডীয়মান পাখিরাও প্রাপ্ত হইতে পারে না।" অর্থাৎ মধ্যাহ্নের সময় সূর্যকে নিরীক্ষণ করা মানুষের পক্ষে কঠিন এবং পাখীদের পক্ষেও তার কাছাকাছি যাওয়া অসম্ভব। একই সূক্তের পরবর্তী ৬নং ঋকে বলা হয়েছে যে, "বিষ্ণু চারটি নব্বই দিনকে চক্রের ন্যায় বৃত্তাকারে চালিত করেন।" এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে বৈদিক যুগে প্রচলিত চার ঋতুর নিয়ন্তা হিসেবে সূর্যের কথা এখানে বলা হয়েছে। ঋগ্বেদের ১/১৫৪/৪-৬, ১/১৫৫/৪, ১০/৩৭নং সূক্তে বিষ্ণু এবং সূর্য উভয়কে জ্যোতির উৎস, অন্ন উৎপাদক, জগতের রক্ষাকর্তা বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ঋগ্বেদের বিভিন্ন সূক্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সূর্য, বিষ্ণু, সবিতা একই দেবতা, অশ্বীদ্বয় তাদের রথের ঘোড়া। আর ঊষা এবং রাত্রি এই দুই দেবী সূর্য এবং বিষ্ণুর গতি দ্বারাই সৃষ্ট। প্রাচীনকালে বড় বড় প্রাকৃতিক সত্তাগুলির বিভিন্ন নাম দেয়া হত; কিন্তু এসব বিভিন্ন নাম একই সত্তাকে নির্দেশ করতো। সূর্যের বিভিন্ন নাম সম্বন্ধে ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৬৪নং সূক্তের ৪৬নং ঋকে বলা হয়েছে : "এই আদিত্যকে জ্ঞানীগণ ইন্দ্র, মিত্র ও বরুণ বলে থাকেন। ইনি স্বর্গীয়, পক্ষবিশিষ্ট এবং সুন্দর গমনশীল। ইনি এক হলেও বিপ্রগণ একে বহু নামে অগ্নি, যম ও মাতারিশ্বা বলে থাকেন।" মনে রাখা দরকার সূর্যের ত্রিপাদ বিক্ষেপের রূপক থেকেই সম্ভবত পরবর্তীকালে ত্রিপাদে বিশ্বভুবন অধিকার এবং বলি দমনের পৌরাণিক কাহিনী রচিত হয়েছিলো। ঋগ্বেদের ১০/১/১-৩ নং ঋকে স্পষ্ট বলা হয়েছে অগ্নি, সূর্য, বিষ্ণু একই দেবতা। দশম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের প্রথম ঋকে অগ্নি এবং সূর্য অভিন্ন করে বলা হয়েছে "ভোর হতে না হতে বৃহৎ এবং সৌন্দর্যময় অগ্নি অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে আলোকজ্বল মূর্তি ধারণ করলেন এবং উজ্জ্বল রশ্মি দিয়ে সমস্ত বিশ্ব আলোকিত করলেন।" পরবর্তী ২য় ঋকে এই অগ্নিরূপী সূর্যকে 'আশ্চর্য বালক' বলে সম্বোধন করা হয়েছে; এবং এর পরবর্তী ৩য় ঋকে স্পষ্ট করে ঘোষণা করা হয়েছে যে, এই অগ্নিই বিষ্ণু, কারণ তিনি চারদিকে ব্যাপ্ত।

১০/৩/১-২নং ঋকে আবার একইভাবে সূর্যকে অগ্নিরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১০/৫/৭ নং ঋকে আবার বলা হয়েছে যে, অগ্নিই সূর্যরূপে ঊর্ধাকাশে অবস্থান করছে। সামবেদ সংহিতাতে (১৭/১/১/১৬২৫-২৬) বলা হয়েছে "হে বিষ্ণু ! এই যে তুমি বললে আমি বালরশ্মি দ্বারা পরিবেষ্টিত, এই কি তোমার একমাত্র রূপ? তুমি সংগ্রামের (আপাত ক্রুদ্ধ অবস্থায় মধ্যদিনে) অন্যরূপ ধারণ করে থাকি; আমাদের কাছে তোমার সেই অন্যরূপ প্রকাশিত কর। ... আমি অতি ক্ষুদ্র, আর তুমি অন্তরীক্ষে লোকের অতি দূরে নিবাসকারী। সেই মহান তোমাকে আমি স্তব করছি।" আবার সামবেদ সংহিতায় (১৮/২/৫/১৬৭০-৭৪) বলা হয়েছে, "বিষ্ণু এই চরাচর বিশ্ব পরিভ্রমণ করেন। এর পদ সুদৃঢ়রূপে অন্তরীক্ষে স্থাপিত। ইনি তিন প্রকারে পদক্ষেপ করেন। বিষ্ণু গোপা অন্তরীক্ষে অবস্থান করে তিন পাদের দ্বারা পৃথিবী পরিক্রমা করেন। এবং সকল ধর্মকে ধারণ করেন। ...যখন বিষ্ণু পৃথিবীর সর্বত্র পরিক্রমা করেন, তখন রশ্মিরূপে দেবগণ আমাদের জন্য পৃথিবীতে প্রবেশ করেন।" এছাড়াও শুক্লযজুর্বেদ সংহিতায় (যেমন ২/২৪-২৬, ৩/৬, ৪/২৯-৩০, ৫/১৪-১৫, ৫/৩৭, ৫৪১, ৯/৩১, ৭/১৬) প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সূর্য ও বিষ্ণুর অভিন্নতার তত্ত্ব বারবার উল্লেখিত হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণে (১৪/১/১/১৫-১৬) বলা হয়েছে, "যজ্ঞের ফল বিষ্ণু প্রথম পেয়েছিলেন, তাই তিনি দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যিনি বিষ্ণু, তিনি যজ্ঞ, তিনিই আদিত্য।" (বিস্তারিত আলোচনার জন্য পড়ুন মৌলবাদ ও মহাকাব্য, পৃষ্ঠা ১২৯-১৩৩)

তাহলে বুঝা যাচ্ছে, সূর্য উপাসনা ছিল বৈদিক ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু। পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের মতো এদেশের তৎকালীন লোকেরা উপলব্ধি করেছিল যে, আকাশের সূর্যই আমাদের এ পৃথিবীতে আলোকের, প্রাণের এবং অন্নের উৎস। অতএব এই শক্তিমান সূর্যকেই ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদীরা (পুরোহিত শ্রেণির লোক) শ্রেষ্ঠ দেবতা জ্ঞান করে যজ্ঞের মাধ্যমে নিরন্তর স্তুতি করতেন, বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য উপহার দিতেন, নিজেদের সামূহিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য তার কাছে প্রার্থনা জানাতেন। এবং পরবর্তীতে তাকে নিয়ে কাহিনী ফাঁদতেন। যার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়, রাম, কৃষ্ণ ইত্যাদি নামধারী কল্পিত ব্যক্তির উপর অবতারত্ব আরোপে। কিন্তু আমরা জানি, আমাদের এই সৌরজগতে সূর্য কতিপয় গ্যাসের সমন্বয়ে গঠিত একটি নক্ষত্র মাত্র। সূর্যের ভেতরের মূল রাসায়নিক উপাদানসমূহ হচ্ছে, হাইড্রোজেন-৯২.১%, হিলিয়াম-৭.৮%, অক্সিজেন-০.০৬১%, কার্বন-০.০৩০%, নাইট্রোজেন-০.০০৮৪%, নিয়ন-০.০০৭৬%, লৌহ-০.০০৩৭%, সিলিকন-০.০০৩১%, ম্যাগনেসিয়াম-০.০০২৪%, সালফার-০.০০১৫% এবং অন্যান্য-০.০০১৫%। সূর্যের মধ্যে প্রতি সেকেন্ডে ৬০০ মিলিয়ন টন হাইড্রোজেন গ্যাস, ৫৯৬ মিলিয়ন টন হিলিয়াম গ্যাসে রূপান্তরিত হচ্ছে আর বাকি ৪ মিলিয়ন টন শক্তিতে পরিণত হচ্ছে; যা আমরা আলো হিসেবে অবলোকন করে থাকি। সূর্যের ভিতরের এই বিপুল পরিমাণ শক্তির উদ্‌গিরণের ফলে সূর্যপৃষ্ঠের প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৪০,০০০ ওয়াট আলোক নিঃসৃত হয়। যদিও এই মহাবিশ্বে সূর্যই একমাত্র বড় বা আলোক উজ্জ্বল নক্ষত্র নয়, সূর্যের থেকে হাজারগুণ বড় এবং আলোক উজ্জ্বল নক্ষত্র রয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই গ্যাসীয় পিণ্ডের একটি পদার্থ কি করে আমাদের এই পৃথিবীতে মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করতে পারে? যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ব্রাহ্মণ্যবাদের পক্ষে সাফাই গাইতে পারে? ভ্রান্ত জ্ঞানের ব্যাপ্তি কতটুকু পল্লবিত হলে এরকম কল্পনা করা সম্ভব? ধরে নিচ্ছি প্রাচীনকালের মানুষের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথাযথ বিকাশ হয়নি বলে তারা এই ধরনের ভ্রান্ত জ্ঞানের শিকার হয়েছিলেন, এ ক্ষেত্রে তাদের কোনো দোষ দেখছি না; হয়তো সেই সময় আমরাও এরকম ভ্রান্ত জ্ঞান চর্চার শিকার হতাম। কিন্তু আজকের এই বিংশ শতাব্দীতে এসেও বিপুল সংখ্যক হিন্দুধর্মাবলম্বীরা (এর মধ্যে ডিগ্রিধারী জ্ঞানীগুণী, রথীমহারথী রাজনৈতিক নেতাকর্মী, আমলা-কামলা থেকে শুরু করে রাস্তার ভিক্ষুক পর্যন্ত রয়েছেন) যখন কৃষ্ণকে বিষ্ণুর (সূর্যের) অবতার বলে ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসেবে দাবি করেন, মন্দিরে গিয়ে পূজা দেন, মথুরায় মসজিদ ভেঙ্গে কৃষ্ণের মন্দির বানানোর জন্য নিজের 'জান কোরবান' করতে ঘোষণা দেন, রাস্তায় গলা ফাটিয়ে অন্ধ-আবেগে মৌলবাদী স্লোগান দেন, তখন তাদেরকে কি বলা যায়?

গীতায় বিজ্ঞান : গীতায় বিজ্ঞানের অন্বেষণে যাওয়ার পূর্বে ইসকন কর্তৃক প্রকাশিত জীবন আসে জীবন থেকে গ্রন্থ থেকে স্বামী প্রভুপাদের কয়েকটি বাক্য (পৃষ্ঠা ২) আরেকবার পাঠ করে আসি (কারণটা এখন বলছি না, একটু পরেই বুঝতে পারবেন) : "একটা কুয়োতে একটা ব্যাঙ ছিল এবং তার এক বন্ধু এসে যখন তাকে প্রশান্ত মহাসাগরের কথা বলল, তখন সে তার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করল, "ওঃ, এই প্রশান্ত মহাসাগরটি কি?" বন্ধু উত্তর দিল, "এটা একটি মহাসাগর—একটি প্রকাণ্ড বড় জলাশয়।" "কত বড়? এই রকম দুটো কুয়োর মতো?" তার বন্ধু উত্তর দিল, "না, না—তার থেকে অনেক বড়।" "কত বড়? এই রকম দশটা কুয়োর মতো? বিশটা কুয়োর মতো?" এইভাবে ব্যাঙ মশাই সমুদ্রের আয়তন সম্বন্ধে অনুমান করতে লাগলেন। কিন্তু এইভাবে কি কখনও প্রশান্ত মহাসাগরের বিশালতা উপলব্ধি করা যাবে? আমাদের ক্ষমতা, আমাদের অভিজ্ঞতা এবং আমাদের অনুমানশক্তি অত্যন্ত সীমিত। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের সমস্ত অনুমানগুলি এই ব্যাঙ মশাইয়ের দর্শনের মতো।" আবার ঐ গ্রন্থের ৭নং পৃষ্ঠায়ও একই কথা বলা হয়েছে, কিন্তু আমি আর তাঁদের বক্তব্য দীর্ঘায়িত করছি না। এবার চলুন গীতায় যাই। গীতা থেকে সামান্য কিছু শ্লোক উদ্বৃত করলে আশা করি আপনারাই অনেক কিছুই বুঝতে পারবেন! ইসকনসহ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দাবি মতো গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (বিষ্ণুর অবতার!) এই বিশ্ব-মহাবিশ্ব সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা; আমাদের মতো নাদান মনুষ্যজাতি থেকে শুরু করে সকল প্রাণী-উদ্ভিদ, জীব-জড় সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন, তিনি সবকিছুতেই আছেন, তিনি সর্বজ্ঞানী, তিনি লোকক্ষয়কারী অতি ভীষণ কাল...! থাক! থাক! আর না। ঈশ্বরের গুণাবলী নিয়ে এতো কথার দরকার নেই; আপনারা আমার থেকে নিশ্চয়ই আরো ভালো জানেন।

গীতার ভগবান মোক্ষযোগ অধ্যায়ে (১৮:৬১) বলেন : "ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি/ভ্রাময়ন সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥" অর্থ হচ্ছে, হে অর্জুন, ভগবান প্রাণীগণের হৃদয়ে বাস করে যন্ত্রারূঢ় পুতুলের মতো মায়া দ্বারা ভ্রমণ করান। বুঝলেন তো ভগবান প্রাণীগণের হৃদয়ে অবস্থান করেন? তা হৃৎপিণ্ড কি? কেনই-বা হৃৎপিণ্ডে অবস্থান করবেন? ওটা তো অনেকটা পাম্প মাত্র, যা সারা শরীরে রক্তপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। আধুনিককালে হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন সমস্যার কারণে ওপেন হার্ট সার্জারি-বাইপাস সার্জারি করা হয়, কিন্তু আত্ম-পরমাত্মা-ভগবানের অস্তিত্ব তো পাওয়া যায় না! থাকলেই না পাওয়া যাবে, কি বলেন? প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় ইসলাম ধর্মের একটি হাদিস আছে, ফেরেশতারা হযরত মুহম্মদের বক্ষবিদারণ করে হৃৎপিণ্ডের জমা রক্ত যা না-কী 'শয়তানি প্রণোদনার উৎস', তা পবিত্র পানি দ্বারা ধৌত করেছিলেন। এ ধারণাটি হাস্যকর। হৃৎপিণ্ড ধোয়ে-পরিষ্কার করে পাপ-চিন্তা দূর করা অসম্ভব; কারণ আমাদের যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা, আবেগ-অনুভূতি (সেটা যতই ঈশ্বর লাভের চেষ্টায় বিভোর থাকুক কিংবা শয়তানি-কূটবুদ্ধি চালিত হোক) সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্ক; তাই প্রয়োজন মস্তিষ্ক ধৌত করা!! আসলে প্রাচীনকালে যখন চিকিৎসাবিজ্ঞান উন্নত ছিল না, তখন মানুষ ভাবতো হৃৎপিণ্ডই সবকিছু (কারণ আপাতদৃষ্টিতে সারা শরীরের মধ্যে একমাত্র হৃৎপিণ্ডেরই স্পন্দন স্পষ্ট অনুভব করা যায়), যেমন ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে হৃৎপিণ্ড (ভুলভাবে আপেলের মতো) অঙ্কিত হয়ে আসছে দীর্ঘকাল ধরে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, গীতার সর্বজ্ঞানী শ্রীভগবান এ ভুলটি করলেন কিভাবে? স্বয়ং ভগবান কি জানতেন না, মস্তিষ্ক আর হৃৎপিণ্ডের কাজের পার্থক্য কী? এবার যাই গীতার কর্মযোগে (তৃতীয় অধ্যায়); সেখানে তিনি বলেন (৩:১৪) : "প্রাণীগণ অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়, বৃষ্টি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়, যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি হয়, কর্ম হইতে যজ্ঞ হয়।" পাঠক 'যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি হয়', অংশটুকু মার্ক করুন। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, বৃষ্টি কিভাবে হয়? কিন্তু গীতার ভগবান তো দেখি দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণির বিজ্ঞান বইয়ের 'পানিচক্র' সম্পর্কেই জানেন না! তিনি আবার লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ কাল, লোক সংহারে প্রবৃত্ত হয়েছেন! গীতার চতুর্থ অধ্যায় জ্ঞানযোগে ভগবান অর্জুনকে বলেন (৪:৫), "তোমার এবং আমার বহু জন্ম হয়েছে; আমি সে সকল জানি, তুমি তা জান না।" আবার দশম অধ্যায়ে বিভূতিযোগে ভগবান বলেন (১০:৩), "তাঁর আদি নাই, জন্ম নাই, সর্বলোকের মহেশ্বর তিনি"। বক্তব্যটা কেমন যেন স্ববিরোধী হয়ে গেল মনে হচ্ছে? স্ববিরোধিতার আরো কিছু উদাহরণ দেই; গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে (মোক্ষযোগ, ১৮:৪০) বলেন, "ন তদস্তি

পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ ।/সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ॥” মানে হচ্ছে, পৃথিবীতে বা স্বর্গে দেবগণের মধ্যে এমন কেউ নেই যে প্রকৃতিজ ত্রিগুণ থেকে মুক্ত হতে পারে। ত্রিগুণটা কি? (গীতার ভাষ্যে) ভগবানের মতে, ত্রিগুণ হচ্ছে সত্ত্ব, রজো, তম! কিন্তু গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্যযোগের ৪৫নং শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে বলেন, “বেদ ত্রিগুণাত্মক, তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও। অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত হও!” কিভাবে সম্ভব? আবার গীতার সন্নাসযোগের ১৫নং শ্লোকে শ্রী ভগবান বলেছেন, বিভু (ভগবান) কারো পাপ বা পূণ্য গ্রহণ করেন না। একই ধরনের বক্তব্য, বলা যায় আরো একটু সুন্দর করে, দয়া এবং উদারতার সাথে রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগে (৯:২৯) ভগবান বলেন, “সমোহহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ।” বাঙলা হচ্ছে, আমি সর্বভূতের পক্ষেই সমান (সমদৃষ্টিসম্পন্ন)। আমার কোনো বিদ্বেষভাজন নেই, প্রিয়ও নেই। অথচ সপ্তম অধ্যায় জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগের ১৫নং শ্লোকে দেখা যায়, যারা ভগবানের ঈশ্বরত্বে, ধর্মমতে অবিশ্বাসী, তাদেরকে তিনি ‘বিবেকশূন্য’, ‘নরাধম’, ‘পাপকর্মপরায়ণ’ হিসেবে অভিহিত করেছেন! ভগবানের প্রচারিত ধর্মের প্রতি যাদের আস্থা নেই, তারা মৃত্যুময় সংসারে বারবার আবর্তিত হয় (৯:৩)! দৈবাসুর-সম্পদ-বিভাগযোগে ভগবান বলেন (১৬:১৮-২০), “বল, দর্প, অহঙ্কার, ক্রোধের বশবর্তী বিদ্বেষকারী ব্যক্তিগণকে আমি অশুভ অসুর যোনিতে অজস্রবার নিক্ষেপ করে থাকি। মূঢ়েরা জন্মে-জন্মে অসুরযোনিপ্রাপ্ত হয় এবং আমাকে না পেয়ে আরো অধমগতিপ্রাপ্ত হয়” (মহাভারতের অনুশাসনপর্বের ১০২নং শ্লোকে অশাস্ত্রীয় কাজ করার ফলে অধমগতি লাভ করে তির্যকযোনিতে জন্মাবার কথা আছে)। দেখা যাচ্ছে, গীতার ভগবানও অন্য অনেক ধর্মের ঈশ্বরের মতো শুধুমাত্র নিজের ভক্তদের প্রতি দয়াশীল; কিন্তু নিরীশ্বরবাদী, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ভয়ানক নিষ্ঠুর! বরং মনে হয় গীতার ভগবান একটু বেশিই এগ্রেসিভ! কারণ আর কোনো ধর্মে এরকম নিরন্তর-জন্মজন্মান্তর ধরে নিরীশ্বরবাদীদের প্রতি, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শাস্তির বিধান (অসুরযোনিতে নিক্ষেপ) আছে কী-না আমার জানা নেই! যাহোক, বুঝি নারে ভাই, বিজ্ঞানময় কিতাবে ভগবান এমন স্ববিরোধী বক্তব্য দেন কিভাবে? আমরা তো জানি বিজ্ঞানের কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্বে পৌঁছুনোর আগে সংগৃহীত তথ্যগুলিতে যদি পরস্পর বিরোধী কোনো বক্তব্য থাকে, তবে সেই তথ্যগুলি তৎক্ষণাৎ বাতিল করে দেওয়া হয়। বিজ্ঞাসম্মত বলে স্বীকার করা হয় না। অনেক প্রক্রিয়ার মধ্যে এটা বিজ্ঞানের একটা মানদণ্ড। ভগবানকে তো পাব না, তাই আজকের যুগের গীতাদরদী ধর্মবণিকদের অনুরোধ করছি, গীতাকে ‘বিজ্ঞানময় কিতাব’ প্রমাণ করতে হলে কষ্ট করে শ্লোকগুলির ঝটপট একটা ভিন্ন ব্যাখ্যা তৈরি করে ফেলুন, অথবা জোড়াতালি দিয়ে পাবলিককে বোঝানোর জন্য বক্তব্য তৈরি করে রাখুন!

গীতার বিভিন্ন শ্লোকে ভগবান আত্ম-পরমাত্মা (ঈশ্বর) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। বেশিরভাগ বর্ণনা পাওয়া যাবে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্যযোগে; সেখানে আত্মার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, চিরস্থায়ী, সর্বব্যপ্ত, সনাতন আবার সাথে-সাথে এও বলা হয়েছে, আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য ইত্যাদি; এমন কী আত্মা হিসেবে ভগবান নিজেকেই দাবি করেছেন (১০:২০)। প্রাচীনকালের চার্বাক দার্শনিকগণ আত্মার অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সেই কবেই, বলেছেন দেহ ছাড়া আত্মা বলে স্বতন্ত্র কিছু নেই; ওগুলো জর্ফরীতুর্ফরী, ধূর্ত পণ্ডিতের বাক্যমাত্র! চার্বাকবাদীদের আত্মা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি বা তাদের নিজস্ব দর্শন নিয়ে জানতে হলে পড়ুন, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের লোকায়ত দর্শন বা ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে গ্রন্থটি। আজকে যুগে বিজ্ঞানও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না; আত্মা বা ভূত ঐ জাতীয় যা কিছু আধোভৌতিক দর্শনের দাবি করে কিছু মানুষ, তা বিজ্ঞানের ভাষায় দৃষ্টিবিভ্রম অথবা মানসিক রোগের লক্ষণ। আত্মার অনস্তিত্ব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে, প্রবীর ঘোষের অলৌকিক নয় লৌকিক গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে; আর আত্মা নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার জন্য পড়ুন অভিজিৎ রায়ের আত্মা নিয়ে ইতং বিতং প্রবন্ধটি। তাই আমি আর এ আলোচনাতে যাচ্ছি না।

গীতার একাদশ অধ্যায় বিশ্বরূপ-দর্শনযোগে ভগবান যখন শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর বিশ্বরূপ ধারণ করলেন (১১:২৩-৩১), ভগবানের আকাশস্পর্শী তেজোময় দীর্ঘ দন্তযুক্ত মুখমণ্ডল, উজ্জ্বল বিশাল চক্ষু, বহু বাহু, বিশাল উরুপদ-

উদর বিশিষ্ট উগ্রমূর্তি দেখে অর্জুন ভয় গেলেন, জানতে চাইলেন তিনি কে? উত্তরে ভগবান জানালেন (১১:৩২), "আমি লোকক্ষয়কারী মহাকাল, লোক সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি... ।" এতো কিছু বলার পরও আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, বিভূতিযোগে (দশম অধ্যায়) নিজের শ্রেষ্ঠত্ব তুলনা করতে গিয়ে ভগবান বললেন (১০:৩১), "তিনি মৎসদের মধ্যে মকর (কুমির), সমস্ত নদীর মধ্যে গঙ্গা!" গঙ্গা নদী কি খুব বিশাল নদী না-কী এ পৃথিবীতে? এর থেকে বড় নদী নাই? না-কী ভগবান সে সকল নদীর নাম জানতেন না? কিংবা গঙ্গার সাথে তুলনা করার অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে, হয়তোবা! এছাড়া দেখুন ভগবান নিজেকে মাছের মধ্যে কুমিরের সাথে তুলনা করছেন (ছি! ছি! হাতির সাথে পিঁপড়ার তুলনা কি যথার্থ!) । কুমির কি মাছ? কুমির হচ্ছে সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী; সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীদের সাথে মাছের পার্থক্য জানতে হলে তো সর্বজ্ঞানী ভগবানকে এখন দেখি মাধ্যমিক শ্রেণীর জীববিজ্ঞান পাঠ করে আসতে হবে! আবার পানিতে কী কুমিরের থেকে বড় কোনো প্রাণী নাই, না ভগবান নিজেও জানেন না এ বিষয়টা । তিমি মাছের নাম কি শুনেছেন? ভগবানের বান্দারা জেনে রাখুন তিমি মাছ কিন্তু মাছ নয় । মনে হয়, গীতার রচিয়তারা তিমি মাছের নাম শুনেন নাই-দেখেন নাই, তাই ওদের ভগবানও শুনেন নাই-দেখেন নাই । মজার কথা হচ্ছে বিভূতিযোগে ভগবান নিজের সাথে ঋতু হিসেবে বসন্তের, মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ (১০:৩৫), পশুর মধ্যে সিংহ, পাখির মধ্যে গরুড় (এই পাখির নাম শুধু আমি হিন্দু ধর্মগ্রন্থেই পেয়েছি, বাস্তবে নিজের চোখে দেখা তো দূরের কথা, কোনো বইয়েও পড়ি নাই!) (১০:৩০), হাতির মধ্যে ঐরাবত, সাপের মধ্যে বাসুকি (গরুড় পাখির মত বাসুকি সাপের নামও শুধু হিন্দু ধর্মগ্রন্থে পেয়েছি, অন্য কোথাও না) (১০:২৭-২৮), মহাভারতে সত্যবাদী হিসেবে যুধিষ্ঠিরকে বাদ দিয়ে অর্জুনের (ধনঞ্জয়) সাথে তুলনা করেছেন, এমন কী ভগবান নিজের সাথে নিজের তুলনা করেছেন (১০:৩৭)!! হায়রে ভগবান! নিজের শ্রেষ্ঠত্ব-বিশালত্ব জাহির করতে গিয়ে এত নিচে নেমে আসতে হল! শেষমেশ হাতি, ঘোড়া, সাপ, পাখির সাথে তুলনা দিলেন? দশম অধ্যায়ের আরেকটি শ্লোক (১০:২১) দেখুন, হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবে! ভগবান বলেন, "আমি আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু, জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে কিরণশালী সূর্য, মরুতদের মধ্যে মরিচি, নক্ষত্রদের মধ্যে চন্দ্র ।" ইসকনের বক্তব্য শুনলে মনে হয়, ভগবদ্গীতা হচ্ছে সর্বজ্ঞানের আকর, বিজ্ঞানময় কিতাব! অথচ ভাবতে অবাক লাগে, ভগবান, মানে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা কি করে নক্ষত্র ও চন্দ্রের মধ্যে পার্থক্য জানেন না? চাঁদের কি নিজস্ব আলো আছে? না নেই, চাঁদ সূর্যের আলোয় আলোকিত, পৃথিবীর একটা উপগ্রহ মাত্র; আজকের যুগের বাচ্চা ছেলেও জানে এটা । পৃথিবী থেকে (আপাতদৃষ্টিতে) রাতের বেলা চাঁদের আলো দেখা যায় বলে কি সর্বজ্ঞানী ভগবান-সৃষ্টিকর্তা সেটাই ধরে নিয়ে বসে আছেন? (তাই তো মনে হয়, কারণ ১৫:১২নং শ্লোকে আবারো ভগবান সূর্য-চন্দ্র-অগ্নির তেজকে তার নিজেরই তেজ হিসেবে অভিহিত করেছেন!) সূর্য কি নক্ষত্র নয়? সূর্য একটা নক্ষত্র এবং সূর্যের থেকে হাজারগুণ বড় নক্ষত্রও আছে এ মহাবিশ্বে । বুঝি নারে ভাই, কোন বিজ্ঞান যে লুকিয়ে আছে এই গীতাতে, ভগবানই জানেন আর ভক্তকূলই জানেন! এরপরও ইসকনের গুরুজি প্রভুপাদ বড়-বড় সবক দেন, মহাশূন্যে অভিযান না-কী সময় ও অর্থের শিশুসুলভ অপচয়!! (দ্রষ্টব্য : জীবন আসে জীবন থেকে, পৃষ্ঠা ১০৬) এসব শুনলে বড্ড করুণা হয় ওদের নির্বুদ্ধিতার জন্য! ইসকনের মাসিক পত্রিকা হরেকৃষ্ণ সমাচারের ভাষ্য মতে, (নোবেল পুরস্কার নিয়ে যাদের এতো গাত্রদাহ!) সেই নোবেল বিজয়ী আইনস্টাইনের ভরশক্তি সমীকরণ ও আপেক্ষিকতার সূত্র গীতা পাঠের ফসল; তারা কি সুনির্দিষ্ট করে বলবেন গীতার কোন কোন শ্লোক পাঠ করে আইনস্টাইন তাঁর বিখ্যাত ভরশক্তি সমীকরণ ও আপেক্ষিকতার সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন? পাঠক আপনারাই বলুন এবার, ইসকনের বই থেকে যে কুয়োর ব্যাঙের গল্প তুলে ধরেছিলাম, প্রকৃত কুয়োর ব্যাঙটা কে?

বেশ আগে কোথায় যেন শুনেছিলাম বিজ্ঞানী ওপেনহাইমার পরমাণু বোমার বিস্ফোরণের তেজ দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গীতার একাদশ অধ্যায় (বিশ্বরূপ-দর্শন-যোগ, ১১:১২) থেকে শ্লোক আবৃত্তি করেছিলেন : "দিবি সূর্য্য সহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা ।/যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥" বাংলা করলে দাঁড়ায়, "যদি আকাশে সহস্র সূর্যের প্রভা যুগপৎ উদিত হয়, তাহলে সেই দীপ্তি বিশ্বরূপের প্রভাব কিঞ্চিৎ তুল্য হইতে পারে ।"

তো কি হল? যদিও আমি জানি না, ওপেনহাইমারের এ ঘটনা সত্য না মিথ্যে, না গুজব, তবে এ থেকে কি পরমাণু বোমার কোনো সূত্র আবিষ্কৃত হয়ে গেল? কিংবা কোনো বৈশিষ্ট্য? কেউ কেউ বলেন, এখান থেকে না-কী বোঝা যায়, হিন্দু ধর্মচিন্তার মধ্যে নিহিত রয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানের নানা সিদ্ধান্ত! বললেই হল? যত্ত সব...! আবার কেহবা গীতায় বর্ণিত কৃষ্ণের বিশ্বরূপ ধারণ এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসীদের-ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের শাস্তি হিসেবে বারবার অসুরযোনিতে জন্ম দেবার হুঁশিয়ারির মধ্যে বিবর্তনবাদের প্রমাণ পেয়ে গেছেন! বিষ্ণুপুরাণ মতে একজন ব্যক্তি স্থাবর জন্ম বিশ লক্ষ যোনি, জলচর নয় লক্ষ যোনি, কুর্ম নয় লক্ষ, পাখি দশ লক্ষ, পশু ত্রিশ লক্ষ, বানর চার লক্ষ... এরকম মোট চুরাশি লক্ষ যোনিতে জন্মের পর মানুষ মনুষ্যযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে থাকে! আর পুরাণের এ বক্তব্যকেই আধুনিককালে বিবর্তনবাদের (এক কোষী থেকে বহুকোষী প্রাণীতে ক্রমবিকাশ) সাথে মিলিয়ে (মূলতঃ গোঁজামিল দিয়ে) হিন্দুধর্মগ্রন্থের 'বিজ্ঞানসম্মত' ব্যাখ্যা দেবার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন হিন্দুধর্মবণিকেরা (দ্রষ্টব্য : শ্রীজগদীশ চন্দ্র ঘোষের শ্রীকৃষ্ণ)! মজার বিষয় হচ্ছে, অধুনা সুডো-মডারেট হিন্দুরা ধর্মগ্রন্থকে বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণের চেষ্ট চালালেও আজকাল গীতা নিয়ে যাদের সবচেয়ে বেশি দৌড়ঝাঁপ, সেই ইসকন পার্টির কাছে বিবর্তনবাদের জনক চার্লস ডারউইন হচ্ছেন একজন মহামূর্খ, বিবর্তনবাদ হচ্ছে একটা ভ্রান্ত মতবাদ, এই মতবাদ যত অগ্রাহ্য করা যায়, ততই ভাল... (দ্রষ্টব্য : জীবন আসে জীবন থেকে, পৃষ্ঠা ৬৭-৬৯)। এখন আমরা সাধারণ মানুষেরা কার কথা মানবো বলেন? তবে কেউ কোনো ধর্মগ্রন্থের কোনো বাণীর সাথে বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্বের সাথে আপাত মিল পেলেই ধর্মগ্রন্থের বক্তব্যকে একেবারে বিজ্ঞানসম্মত দাবি করলেই তো হয় না। প্রমাণ তো লাগবে; গীতাদরদীদের সেই প্রমাণ কোথায়? হিন্দু ধর্মগ্রন্থ গীতা বা পুরাণ পাঠ করলে দেখা যায়, কর্মফলের কারণে বিভিন্ন হীনযোনিতে জন্মগ্রহণের পর মনুষ্য জন্ম এবং পাপের ফলে পুনরায় হীনযোনিতে জন্মগ্রহণের যে ধারণা দেয়া হচ্ছে, তা অবশ্যই ব্যক্তি পর্যায়ে (দেখুন গীতার ৯:৩০-৩২, ১০:৩নং শ্লোক)। গীতার ভাষ্য থেকে ধরে নেওয়া যায়, প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে পৃথকভাবে এ ধরনের কথিত অগ্রগতি বা অধমগতি উভয়েই ঘটতে পারে। কিন্তু বিবর্তনবাদ অনুসারে জৈববিবর্তন কোনো ব্যক্তিগত প্রক্রিয়া নয়, বলা যায় এটি সামগ্রিকভাবে একটি প্রজাতির সমগ্র প্রাণীর বা সমগ্র জনগোষ্ঠীর পরিবর্তনের প্রক্রিয়া বা ঘটনা। বির্বতনবাদ অনুসারে প্রজাতির পরিবর্তন প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বংশানুক্রমিক গুণাবলীকে বোঝায় (এখানে বিবর্তনবাদ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই); কোনো পাপ-পূণ্যের কারণকে কিংবা কর্মফলকে বোঝায় না। বলা যায় বিবর্তনবাদের মূল ধারণা ও প্রক্রিয়ার সাথে গীতাসহ অন্যান্য হিন্দু ধর্মগ্রন্থে উল্লেখিত জন্মান্তরবাদ, কর্মফল ইত্যাদি বক্তব্যের মূলগত দিক থেকে পরস্পর বিরোধিতা-বৈপরীত্য রয়েছে (যেমন বিবর্তনবাদ আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করে)। তাই হিন্দু ধর্মগ্রন্থের কিছু শব্দের আপাত সাদৃশ্যের ভিত্তিতে একে বিবর্তনবাদের (বা বিজ্ঞানের) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে দাবি করা, চরম মূর্খতা-শঠতার লক্ষণ (দ্রষ্টব্য : বিজ্ঞানের মৌলবাদী ব্যবহার, পৃষ্ঠা ১৮-১৯)। অতএব গীতার বিশ্বরূপ দর্শনের বর্ণনা, কিংবা শাস্তি হিসেবে আসুরিক যোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্মের হুঁশিয়ারি, এসবই সাহিত্যিক রূপক হিসেবে গ্রহণ করা যায়; বাস্তব ঘটনা বা বিজ্ঞান হিসেবে কখনো নয়। তাছাড়া এভাবে গোঁজামিল দিয়ে মিলাতে চাইলে তো যে কেউ শুধু ধর্মগ্রন্থ কেন, অনেক কবির যত্রতত্র কবিতা-গানের মধ্যেও বিজ্ঞানের সন্ধান পেয়ে যাবেন! যেমন ধরেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা, "আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ/চুনি উঠল রাঙা হয়ে/আমি চোখ মেললুম আকাশে/জ্বলে উঠল আলো/পূবে পশ্চিমে/গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, সুন্দর"। এখন কবিগুরুর এই কবিতা থেকে কেউ যদি আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের চেতনাশক্তির দ্বারা সৃষ্ট অনুভূতি, আলোক তরঙ্গ, তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ ইত্যাদি পেয়ে যান, বা বিজ্ঞানের সাথে মিলিয়ে (আসলে গোঁজামিল দিয়ে) ব্যাখ্যা করতে বসেন, তবে তা 'পাগলের প্রলাপ' ছাড়া আর কি হতে পারে? আমি এখানে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে দোষ দিচ্ছি না, আমার সে যোগ্যতাই নেই; আমি বলছি, কেউ যদি কবিতার লাইন, পংক্তি ইত্যাদির সাথে বিজ্ঞান মেলাতে চান, রূপক অর্থ করে হলেও বিজ্ঞানসুলভ ব্যাখ্যা দিতে চান, তবে সেটা অবশ্যই দোষের, সেটা বর্জনীয়। পাঠক, কাব্য ঢঙে সাজনো হেঁয়ালিপূর্ণ শ্লোকের অনুবাদে গোঁজামিল দিয়ে, চাতুর্যতার সাথে রূপক ব্যাখ্যা করে মিলাতে চাইলে আপনারাও এ রকম অসংখ্য কবির কবিতায় শুধু বিজ্ঞান নয়, জ্যোতিষী কিরো-নস্ত্রাদামুসকে হার মানিয়ে বিভিন্ন

ভবিষ্যৎ বাণীও পেয়ে যেতে পারেন! উদাহরণ দিলে হয়তো বিষয়টি বুঝতে সহজ হবে; যেমন কবি জীবনানন্দ দাশের আট বছর আগের একদিন কবিতার প্রথম দুই লাইন দেখুন : "শোনা গেল লাশকাটা ঘরে/নিয়ে গেছে তারে..." । সবাই নিশ্চয়ই জানেন ১৯৫৪ সালের ১৪ অক্টোবর একটি ট্রাম দুর্ঘটনায় আহত হয়ে কবি জীবনানন্দ ২২ অক্টোবর মারা যান । এ লাইন দুটো থেকে কি ধরে নিব, কবি আগেই নিজের মৃত্যু সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করে গেছেন? চাইলে গোঁজামিল দিয়ে কবি জীবনানন্দকে জ্যোতিষী জীবনানন্দ বানিয়ে দেয়া যাবে! সাথে আরো বলে রাখি আমাদের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের কবিতাতেও না-কী কবির শেষসময়ের অসুস্থতার খবর খুঁজে পেয়েছেন কেউ কেউ! যুক্তি হিসেবে তুলে ধরছেন কবির চক্রবাক কাব্যগ্রন্থের বাতায়ন-পাশে গুবাক-তরুর সারি কবিতার মধ্যের কিছু লাইন : "তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু, আর আমি জাগিব না,/কোলাহল করি' সারা দিনমান কারো ধ্যান ভাঙিব না ।/—নিশ্চল নিশ্চুপ/আপনার মনে পুড়িব একাকী গন্ধবিধুর ধূপ ।" আবিষ্কারকর্তাদের বলিহারি এ আবিষ্কার দেখে আমি নিজেই নির্বাক হয়ে গিয়েছিলাম তৎক্ষণাৎ!

গীতায় শ্রীভগবানের উবাচ : ভারতবর্ষে বৈদিকযুগের সমাজ ব্যবস্থায় হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চার শেণীতে বিভক্ত ছিল । সমাজের উপরতলার মানুষ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়রা আর নিচুতলার মানুষ বৈশ্য আর শূদ্ররা । সমাজ-কাঠামোর সকল সুযোগ-সুবিধা, শাসন-ক্ষমতা ভোগ করতো ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় শোষক-গোষ্ঠী আর উদয়-অস্ত শ্রম দিয়ে সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থা, ভোগের যোগান টিকিয়ে রাখতো বৈশ্য-শূদ্ররা । 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই' ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের আঁতাত সম্পর্কে মনুসংহিতায় খুব সুন্দর করে বর্ণিত হয়েছে (৯:৩২২) : "ব্রাহ্মণহীন ক্ষত্রিয় উন্নতি লাভ করতে পারে না, আর ক্ষত্রিয়হীন ব্রাহ্মণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মিলিত হয়ে ইহলোকে ও পরলোকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ।" এই ইহলোকে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মিলিত শাসনে বৈশ্য থেকে শূদ্রদের সামাজিক অবস্থান ছিল আরো করুণ! সঠিকভাবে বলতে গেলে, শুদ্র আর নারী (সে ব্রাহ্মণ কন্যা বা পত্নীই হোক আর শূদ্রাণী হোক), উভয়ের সামাজিক অবস্থান ছিল প্রায় এক সূতায় গাঁথা । অন্য একটি প্রবন্ধে (দেখুন সনাতন ধর্মের দৃষ্টিতে নারী) আমি হিন্দুদের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ (মনুসংহিতা, মহাভারত, গীতা ইত্যাদি) থেকে প্রাচীন ভারতের নারীদের সামাজিক অবস্থান চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি; তাই গীতা নিয়ে এ আলোচনায় নারীর অবস্থানের বিষয়টি এখানে টানছি না । তবে সমাজের সবচেয়ে নিচুজাত হিসেবে পরিচিত শূদ্র সম্পর্কে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছি, কারণ যাদের পিঠে চড়েই পরগাছা আর্য শ্রেণী (ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়) চিরকালই ভোগবিলাসে জীবন কাটিয়েছে, সেই পরগাছাদের রচিত কথিত ধর্মগ্রন্থগুলিতে শূদ্রদের কি অবস্থান চিহ্নিত করা হয়েছিল, তা অবশ্যই আলোচনার বিষয়; সাথে একটি বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে, প্রাচীন ভারতের ঐ সময়ে তো আজকের মতো সংবিধান-আইন-কানুন ছিল না, ধর্মগ্রন্থের বাণীগুলোই (ঈশ্বরের বক্তব্য হিসেবে প্রচার করে) রাজার আইন হিসেবে, সামাজিক অনুশাসন হিসেবে ব্যবহৃত হত ।

বর্তমান হিন্দু আইনের উৎস মনুসংহিতা ও ভগবদ্গীতা পাঠ করলে দেখা যায়, দুটো গ্রন্থের শ্লোকগুলোতে প্রচুর মিল আছে; এবং এ কথা মনে রাখতে হবে (অবশ্য গীতা পাঠ করলে এমনিতেই বোঝা যায়), গীতার বেশিরভাগ বক্তব্যই সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক ও হেঁয়ালিপূর্ণ দার্শনিকরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে, মাঝে-মাঝে সর্বজনীন রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে । কোনো ধর্মগোষ্ঠী, জনগোষ্ঠীর নাম উল্লেখ ছাড়াই সরাসরি আক্রমণ না করে পরোক্ষভাবে আক্রমণ করা হয়েছে; যেমন গীতার অনেক জায়গায় দেবতাদের প্রশংসা করা হয়েছে, অসুরদের তীব্র নিন্দা ও যুগযুগ ধরে প্রচণ্ড শাস্তি প্রদান করার কথা ঘোষিত হয়েছে । কিন্তু এই দেব কারা বা অসুর কারা সেটা গীতায় যথেষ্ট ব্যাখ্যা করা হয়নি (তবে গীতার নবম অধ্যায়ের বত্রিশ-তেত্রিশ নম্বর শ্লোক পাঠ করলে কিছুটা বুঝা যায়) । বরং ঋগ্বেদ, মনুসংহিতা, মহাভারতে দেবতা-অসুরদের রূপ উন্মোচন করা হয়েছে । তাই গীতার অনেক শ্লোকের সঠিক অর্থ উদ্ঘাটনের জন্য আমাদের অবশ্যই মনুসংহিতাসহ অন্যান্য কয়েকটি ধর্মগ্রন্থের দ্বারস্থ হতে হবে । মনুসংহিতার

দৃষ্টিতে সমাজের শ্রমজীবী মানুষ শূদ্ররা হচ্ছে উনমানুষ! আর ভগবদ্গীতায় লক্ষ্য করা যায় স্বয়ং ভগবান (?) মনুসংহিতার দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করে তা 'ঈশ্বরের সৃষ্টি' বলে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা প্রদানের চেষ্টা করেন। হিন্দুসমাজের কুৎসিৎ চতুর্বর্ণপ্রথা সম্পর্কে জানতে এবং মনুসংহিতায় শূদ্রের অবস্থান পাঠ করতে বাঙলা ভাষায় বেশকিছু গবেষণামূলক গ্রন্থ রয়েছে, যেমন রামশরণ শর্মা রচিত প্রাচীন ভারতে শূদ্র, কঙ্কর সিংহের মনুসংহিতা এবং শূদ্র ইত্যাদি; আগ্রহীরা গ্রন্থগুলো পড়ে দেখতে পারেন। আমি সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদকৃত মনুসংহিতার কয়েকটি শ্লোক থেকে মনুসংহিতায় শূদ্রের অবস্থান নির্দেশের চেষ্টা করবো, সাথে আরো কয়েকটি ধর্মগ্রন্থেরও (প্রয়োজনানুসারে) উদৃতি দেব : শূদ্রের সৃষ্টি সম্পর্কে মনুসংহিতা বলা হয়েছে, লোকবৃদ্ধির জন্য (স্রষ্টা) মুখ, বাহু, উরু ও পদ থেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সৃষ্টি করলন (১:৩১); আর কিছু পরের শ্লোকে (১:৯২) আছে, ব্রহ্মার কাছে নাভির ঊর্দ্ধভাগ পবিত্রতর, এর মধ্যে মুখ পবিত্রতম! মহাভারতের অনুশাসনপর্বে (৩৫/১) বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণ জন্মমাত্রই অন্য বর্ণের গুরু! ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের পুরুষ সূক্তে বলা হয়েছে, সেই বিরাট পুরুষের ব্রাহ্মণ মুখ, ক্ষত্রিয় বাহু, বৈশ্য উরু এবং শূদ্র পদ (১০/৯০/১২); মহাভারতের শান্তিপর্বের ৪৬নং শ্লোকে হুবুহু একই ভাষায় চতুর্বর্ণের কথা বলা হয়েছে। মনুসংহিতায় (১:৯১) ঈশ্বর কৃর্তক নির্দেশিত শূদ্রের একটি মাত্র কর্মের কথা বলা হয়েছে, সেটা হল বাকি তিন বর্ণের অসূয়াহীন সেবা! কিন্তু তিন বর্ণের কাজের মধ্যে ব্রাহ্মণের কাজ অধ্যাপনা-যাজন-যজন-দান-প্রতিগ্রহ, ক্ষত্রিয়ের কাজ লোকরক্ষা-দান-অধ্যয়ন-যজ্ঞ, বৈশ্যের কাজ পশুপালন-দান-অধ্যয়ন-কৃষি ইত্যাদি (১:৮৮-৯০)। মনুসংহিতার ২:৩১ শ্লোকে বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণের নাম শুভসূচক, ক্ষত্রিয়ের নাম বলবাচক, বৈশ্যের নাম ধনবাচক আর শূদ্রের নাম হবে নিন্দাবাচক! ১০:৩১নং শ্লোকে বলা হয়েছে শূদ্র সক্ষম হলেও ধন সঞ্চয় করতে পারবে না! শূদ্রের দাসত্ব থেকে কোনো মুক্তি নেই, বরং সে ব্রাহ্মণের দাসত্বের জন্যই ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্টি হয়েছে (৮:৪১৩-৪১৪)! ৮:২৮১নং শ্লোকে আছে শূদ্র যদি কখনো ব্রাহ্মণের সঙ্গে একাসনে বসে তবে শূদ্রের কটিদেশে গরম লোহার ছ্যাঁকা দিয়ে নির্বাসন দেয়া হবে! অপরাধী বিচারের ক্ষেত্রে ছিল চরম বৈষম্য, শূদ্র ব্রাহ্মণপত্নীগমন করলে শাস্তি ছিল মৃত্যু (৮:৩৩৬); পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ শূদ্রাণীকে বলৎকার করলেও শাস্তি ছিল অর্থদণ্ড মাত্র (৮:৩৮৫)। ব্রাহ্মণকে চোর বলে গালি দিলে শূদ্রের শাস্তি প্রাণদণ্ড, ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে অর্থদণ্ড (৮:৬৭-৬৮)! আসলে গোটা মনুসংহিতা জুড়েই রয়েছে শূদ্র নিষ্পেষণ, নিপীড়নের বাণী; ন্যূনতম মানবিক অধিকার স্বীকার করা হয়নি এ গ্রন্থে। তাই বলা যায় মনুসংহিতা হচ্ছে 'শূদ্র নিপীড়নসংহিতা'! পরিসর সীমিত রাখার জন্য মনুসংহিতা থেকে আর নয়। এবার আরো কিছু ধর্মগ্রন্থ থেকে শূদ্রের অবস্থান দেখা যাক : ঐতরেয় ব্রাহ্মণ মতে (৭/৩৫/৩), শূদ্রকে ইচ্ছা করলে উচ্চবর্ণীয়রা তাঁর বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ করতে পারবে, বাধা দিলে হত্যা করার বিধান রয়েছে; যজ্ঞকালে শূদ্ররা নিষিদ্ধ ব্যক্তি বলে গণ্য হবে (শতপথ ব্রাহ্মণ, ৩/১/১/৯); শূদ্রের পক্ষে বেদমন্ত্র পঠন তো দূরের কথা শ্রবণও নিষিদ্ধ (গৌতম ধর্মসূত্র, ১৬:১৯); শূদ্র যদি বিপন্ন হয়েও উচ্চবর্ণীয়দের সঙ্গে কথা বলেন, কিংবা তাঁর মুখের দিকে তাকান, তাহলে শাস্তি ছিল জীবন্ত পুড়িয়ে মারা (গৌতম ধর্মসূত্র, ২/২/৩/৩৩)। ব্রাহ্মণ যদি কোনো শূদ্রাণীকে বৈধভাবে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন, তাহলেও সেই মহিলার গর্ভজ সন্তান পিতৃসম্পত্তির অংশ পাবে না। শুধুমাত্র তার ভরণপোষণের খরচটুকু দেবে তার বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা, যারা উচ্চবর্ণীয় নারীর গর্ভজাত (গৌতম ধর্মসূত্র, ২৮:৩৭); কোনো দাস/শূদ্র তাঁর প্রভুর অন্যায় বা অনাচার সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারবে না (কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, ৩:১)।

সম্ভবত আর উদাহরণ অন্বেষণ নিষ্প্রয়োজন! এই তালিকা ভাসমান 'সামাজিক' হিমশৈলের শীর্ষাংশ মাত্র! এ রকমের শতশত বিধান ঈশ্বরের বাণী হিসেবে প্রচার করে প্রাচীন ভারতের রাজন্যবর্গ আর পুরোহিত শ্রেণী সমাজ জীবনকে আষ্টেপ্রষ্ঠে বেঁধে রেখেছিলো; সমাজপতিরা নির্দ্বিধায় তথাকথিত ধর্মবিধানের দোহাই পেড়ে সমাজের বৃহত্তমসংখ্যক মানুষকে তাঁদের প্রাপ্য মানবিক অধিকার (মর্যাদা তো পরের কথা) থেকে বঞ্চিত করেছেন, লাঞ্ছিত করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই সকল অপহ্নবকের পক্ষে সাফাই গেয়ে, বর্ণভেদ প্রথার গুরুতর আর্থ-সামাজিক অসাম্যকে ঐশ্বরীয় সমর্থন দেবার উদ্দেশ্যে যখন গীতায় শ্রীভগবান (৪:১৩) বলে উঠেন, "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং

গুণকর্মবিভাগশঃ ।/তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্ ॥" । অর্থাৎ, গুণ অনুযায়ী কর্মের বিভাগ অনুসারে আমা দ্বারা চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্টি হয়েছে। আমাকে তার কর্তা এবং অব্যয় অকর্তা রূপে জানবে। মানেটা কি হল? শূদ্রদের জন্য এতো অন্যায় রীতিনীতি-নির্দেশ দয়ালু ভগবান নিজের সৃষ্টি বলে সাফাই গেলেন! অবশ্য ভগবান আগেই জানিয়ে দিয়েছেন (গীতা, ৪:১), গীতার তত্ত্ব তিনি না-কী আগেই সূর্যকে বলেছিলেন, সূর্য মনুকে, মনু স্বপুত্র ইক্ষাকুকে বলেছিলেন। যা হোক, ভগবান ভগবদ্গীতায় আরও বলেন (১৪:১৮), "ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ ।/ জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥" অর্থাৎ, সত্ত্বগুণের অধিকারীরা ঊর্ধ্বে যায়, রজঃগুণসম্পন্নরা মধ্যে অবস্থান করে, আর তমগুণসম্পন্ন লোকেরা জঘন্য বৃত্তিতে নিযুক্ত হয়ে অধোগামী হয়। কিন্তু ভগবানের দৃষ্টিতে সত্ত্বগুণের অধিকারী কারা, রজঃ বা তমোগুণসম্পন্ন কারা, সেটাতো আগে দেখতে হবে। এ বিষয়ে মনুসংহিতা থেকে দেখা যায়, সত্ত্বগুণজাত হচ্ছে ব্রহ্মা, বিশ্বস্রষ্টাগণ যজ্ঞকারী, ঋষি, দেবতা, বেদ তপস্বী, সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ প্রমুখ (মনুসংহিতা, ১২:৪৮-৫০); রাজা, ক্ষত্রিয়, যক্ষ, দেবগণের অনুগামী, অস্ত্রজীবী লোক প্রমুখ রজোগুণসম্পন্ন; আর হাতি, ঘোড়া, শূকর, শূদ্র, নিন্দিত ম্লেচ্ছ, সিংহ, বাঘ, ধর্মাচরণকারী, রাক্ষস, পিশাচ হচ্ছে তমোগুণজাত (১২:৪৩-৪৪)। তাহলে এ বিষয়ের সন্দেহের অবকাশ নেই, যে ভগবদ্গীতার ১৪তম অধ্যায়ের ১৮নং শ্লোকের এই উক্তির মাধ্যমে আর্যসমাজ এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রচলিত আর্থসামাজিক কাঠামোয় ব্রাহ্মণ্যদের উচ্চস্থান, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের মধ্যস্থান আর শূদ্রের নিম্নস্থানের ইঙ্গিত করা হচ্ছে। দয়াময় ভগবান, যিনি সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে অবস্থান করেন বলে দাবি করেন, অথচ তিনি গীতায় বলে উঠেন (১৭:১০) : "যাতযামং গতরসং পূতি পর্যুষিতঞ্চ যৎ ।/উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥"; বাঙলা করলে হয়, বহুদিনের পূর্বের বাসী, রসশূণ্য, দুর্গন্ধযুক্ত, উচ্ছিষ্ট এবং অপবিত্র খাদ্য তমোগুণ সম্পন্ন লোকের প্রিয়। হায়রে! সর্বজ্ঞ ভগবান কি জানেন না যে, এরকম খাবার তথাকথিত তামস প্রকৃতির শুদ্রলোকেরা ভালোবেসে খায় না! বাসী, নিরস, উচ্ছিষ্ট এবং অপবিত্র খাবার তারা দারিদ্রের পীড়নে খেতে বাধ্য হয়। বাসী-নিরস-উচ্ছিষ্ট খাবার কারো-ই বা খেতে ভালো লাগে? অথচ শ্রীভগবান নিকৃষ্ট খাদ্য গ্রহণকেই শুদ্রদের স্বভাবজ তমগুণের লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন! সাধারণ চিন্তা থেকেই বোঝা যায়, তৎকালীন যুগের অমানবিক আর্থসামাজিক কাঠামোকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই কুখ্যাত চাতুর্বর্ণ প্রথাটি শ্রীভগবানের মুখ দিয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা (ক্ষত্রিয়দের যোগসাজশে) বলিয়েছে; শ্রীভগবানের দোহাই দিয়ে, ধর্মীয় ভাবাবেগ তৈরি করে, দারিদ্র, ক্লিষ্ট, অনাহারী মানুষেরা (শূদ্ররা) যেন তাদের (ব্রাহ্মণ্যদের) ক্ষমতার প্রতি অফুরন্ত লিপ্সা মিটিয়ে চলে বিনা প্রশ্নে, বিনা বাঁধায়। এখানে একটি বিষয় ছোট করে বলে নেয়া যায়, পৃথিবীর অনেক দেশেই প্রাচীনকালে শ্রম বিভাজনের ভিত্তিতে এক ধরনের আদিম শ্রেণিবিভাগভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠেছিল। এই শ্রমবিভাজনভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার সবচেয়ে নির্যাতিত শ্রেণী সময়-সুযোগ পেলেই আর্থ-সামাজিক কাঠামোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ বিদ্রোহ করেছে। এখান থেকেই শ্রমিকশ্রেণীর মানবমুক্তির বীজ বপিত হয়েছে; যেমন প্রাচীন চীন দেশে বারবার কৃষক বিদ্রোহ হয়েছে, রাজশক্তি বা শোষকগোষ্ঠী বারবার প্রতিহিত হয়েছে। গ্রিক সাম্রাজ্যে, রোমান সাম্রাজ্যে বারবার দাস বিদ্রোহ হয়েছে। এমন কী ১৭৮৬-১৭৯৫ সাল ব্যাপী সংঘটিত ফরাসী বিপ্লব পৃথিবীর গণমানুষের চেতনায় মোড় ঘুড়িয়ে দিল। কিন্তু ভারতবর্ষে এরকম শ্রমিকশ্রেণীর জেগে উঠার নজির ইতিহাসে তেমন খুঁজে পাওয়া যায় না (মৌর্যযুগের শেষের শূদ্রবিদ্রোহ বাদে)। কারণটা কি? কারণ হচ্ছে ধর্ম নামক আফিম। আমার জানা মতে পৃথিবীর আর কোনো দেশে এরকম শ্রেণীবিভাগের কাঠামোকে ধর্মীয় আবরণে বংশানুক্রমিক ও চিরস্থায়ী করার রীতি ছিল না কিংবা সম্ভবও হয়নি। ভারতবর্ষেই একমাত্র মনুসংহিতা-গীতা-উপনিষদ ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে কর্মফল, জন্মান্তরবাদ, অবতারতত্ত্ব ইত্যাদির দোহাই দিয়ে নির্যাতিত শ্রমিকশ্রেণীসহ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ আমজনতাকে বেঁধে ফেলে ধর্ম নামক আফিমকে 'পৌরাণিক ঐতিহ্যে'র নামে গলাধঃকরণ করিয়ে গুটিকয়েক ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়গোষ্ঠীর স্বার্থে দাস শ্রেণীতে পরিণত করাই ছিল শাস্ত্রকারদের মূল লক্ষ্য। ধর্মের নামে সামাজিক শোষণ আর নিপীড়নের এতো দীর্ঘস্থায়ীরূপ দেখে বলা যায়, তারা তাতে সফলকামও হয়েছিল!

এবার আলোচনাটুকু গুটিয়ে আনি; উপরের বিস্তারিত আলোচনা থেকে দেখা যায়, ভগবদ্গীতা ব্রাহ্মণ্য-ক্ষত্রিয়দের নিজস্ব কাঠামো, শাসন-শোষণ, চাতুর্বর্ণ প্রথা টিকিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন ব্রাহ্মণ্যদের সুদীর্ঘ সময় ধরে সুকৌশলে রচিত। এটি কোনোভাবেই কোনো দেবতার মুখঃনিসৃত বাণী নয়; নয় কোনো অলৌকিক কিছু! স্বয়ং ভগবানের অস্তিত্বই যেখানে প্রশ্নবিদ্ধ। গীতা কোনো বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ নয়; নয় কোনো আধ্যাত্মিক গ্রন্থ। হতে পারে, প্রাচীন সাহিত্য হিসেবে এর ঐতিহাসিক একটা মূল্য রয়েছে, কিন্তু স্পষ্ট করে বলা যায়, বর্তমানে গণমানুষের কল্যাণের জন্য-মুক্তির জন্য, বিজ্ঞান-দর্শন চর্চায়-প্রসারে, জ্ঞানের বিকাশে এর বিন্দুমাত্র কোনো ভূমিকা নেই।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

(১) শ্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ (সম্পাদিত), ১৯৯৭, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলকাতা।

(২) শ্রীমৎ স্বামী আত্মানন্দ গিরি মহারাজ (সম্পাদিত), ২০০৫, শ্রীগীতা, চন্ডিমুড়া, কুমিল্লা।

(৩) সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভূমিকা, অনুবাদ, টীকা), ২০০২, মনুসংহিতা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

(৪) জয়ন্তানুজ বন্দ্বোপাধ্যায়, ১৯৯৭ (প্রথম সংস্করণ ১৯৯৪), সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবদ্গীতা, এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা।

(৫) শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, ২০০৪ (প্রথম সংস্করণ ১৯৮৩), জীবন আসে জীবন থেকে, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, পশ্চিমবঙ্গ।

(৬) শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, ২০০১, কৃষ্ণভক্তি সর্বোত্তম বিজ্ঞান, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, পশ্চিমবঙ্গ।

(৭) জয়ন্তানুজ বন্দ্বোপাধ্যায়, ১৯৯৬ (প্রথম সংস্করণ ১৯৯০), মহাকাব্য ও মৌলবাদ, এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা।

(৮) ড. আর. এম. দেবনাথ, ২০০৫ (প্রথম সংস্করণ ২০০১), সিন্ধু থেকে হিন্দু, রিডার্স ওয়েজ, ঢাকা।

(৯) ভবানীপ্রসাদ সাহু, ২০০১, ধর্মের উৎস সন্ধানে, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, কলকাতা।

(১০) পল্লব সেনগুপ্ত, ১৯৯৯, ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা : উৎসের সন্ধানে, সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা।

(১১) মনিরুল ইসলাম, ২০০৮, বিজ্ঞানের মৌলবাদী ব্যবহার, ক্যাথার্সিস পাবলিশিং, ঢাকা।

(১২) আন্তর্জালিক ঠিকানা : http://www.iskcon.com/worldwide/centres/asia.html

(১৩) আন্তর্জালিক ঠিকানা : http://www.solarviews.com/eng/sun.html

(১৪) আন্তর্জালিক ঠিকানা : http://observe.arc.nasa.gov/nasa/exhibits/sun/sun_5.html

---

অনন্ত বিজয়, শাহাজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, এবং যুক্তি পত্রিকার সম্পাদক। মুক্তমনার একজন নিবেদিতপ্রাণ সদস্য। সংরক্ষনশীল সনাতন ধর্মের মিথ, কুসংস্কার এবং অনুদার সমাজ কাঠামোর একজন প্রবল সমালোচক। মানবতা এবং যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠায় অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০০৬ সালে মুক্তমনা এওয়ার্ড পেয়েছেন।